ছোটোবড়ো গল্পগ্রন্থের প্রথম সংস্করণের হাফটাইটেল

ভালোবাসা

দুপুরটা নিদারুণ, অসহ্য। মন কেমন করার চোটে শরীরটাও অস্থির অস্থির করে মালতীর। একটা অবাস্তব গর্ব, পরস্মৈপদী অহংকার শুধু আঁকড়ে থাকে যে পরের জন্য মন-কেমন করার নামই ভালোবাসা। বিপিনের জন্য কী কেমনটাই করে তার মন !

মনে হয়, ভালোবাসতে পারার ক্ষমতার তার শেষ নেই, তুলনাও নেই। জগৎকে ডেকে বলতে ইচ্ছে হয়, আমার দিকে চেয়ে দেখ। এমন ভালোবাসা দেখেছ কখনও ? এমন ভালো কখনও বেসেছ ? দেখবে কোথায়, বাসবে কাকে !

বিপিন তাব স্বামী, এই যা। বিয়ে তাদের হয়েছে মোটে বছরখানেক। লোকে শুনলে মুচকে হাসবে, ভাববে যে তাই বল, বাপের কিনে দেওয়া ববটি এখনও আনকোরা। কেউ মানবে না যে তার ভালোবাসা এমন একটা বিশেষ কিছু। তার মন কেমন করার পরিমাণটা কে জানবে !

অনেকের মধ্যে দিন কাটে, ঘরে এবং বাইরেও, তবু মালতীর একেবারে একা হযে থাকার মারাত্মক অনুভূতি ঘোচে না। তারই ভালোবাসার অসাধারণত্বে তার হৃদয়-মন যেন অস্পৃশ্য হয়ে গেছে ; জগতের জমজমাট জীবনের বিপুল আলোড়নেব ছোঁয়াচ পায় না। বিপিনের কাছে থেকেও, বুকের সঙ্গে লেগে থেকেও তার যে হৃদয়টি অপূর্ণতা অনাশ্বাসেব ব্যথায় টনটনিয়ে থাকে, নিজেব সেই হৃদয়টিব জন্য তার এমনই মমতা যে অন্য হৃদয়গুলির ব্যথা-বেদনা থেকে সেটাকে সে সর্বদা সযত্নে বাঁচিয়ে চলে।

পাশের বাড়ির বউ। চিন্তিত মুখখানা কাতবতায় থমথম করছে। সাজা পানটি মুখে তুলতে ভুলে গিয়ে ধরে আছে হাতে।

প্রাণ হাতে যাওয়া, প্রাণ হাতে ফেরা। দুকুরটা কাটে না ভাই।

শুধু দুকুরটা কাটে না ? তাতেই এত ! মালতীর শুধু দুপুর নয, বুকের ধুকধুকানির কখনও তাব বিরাম নেই। বাড়ি ফিরলেও কি শান্তি আছে ? আজকের মতো নয় নিশ্চিন্ত, কাল ? কাল তো আবার যেতে হবে, ফিরতে হবে ? সব সময়েই মনটা আকুলি-বিকুলি করে মালতীর।

দুপুর গমগম করে অভিশপ্ত স্তব্ধতায়, তার মধ্যে হঠাৎ ভেসে আসে মবণাহত উন্মত্ত শহবের হিংস্র আস্ফালন, আত্মনাশা আর্তনাদের কলরব।

ঘরেই কি স্বস্তি আছে ? কখন কী হয়, কখন কী হয়। এ বস্তিতে আগুন, ও বস্তিতে আগুন, এ পাড়ায় হানা, ও পাড়ায় হানা—বাপ্‌বে। আমাদের মেয়েদেরই যত জ্বালা—ভয়েও মরি, ভাবনাতেও মরি। কাগজে পড়ি এতগুলো মরেছে ; এতগুলো হাসপাতালে গেছে—ওদের মা বউয়ের কথা ভাবলে বুক ফেটে যায় ভাই, ঘোমটা দিক আর বোরখা পবুক, যে আবাগির সর্বনাশ হয়...

বুকটা যেন ফেটে যাবে মালতীরও অজানা অচেনা ওই আবাগিগুলির মতো। বিপিন যদি না ফেরে আজ ! কী করবে সে, পাগল হয়ে যাবে, না গলায় দড়ি দেবে ! নিজেকে ওই আবাগিদের দলে কল্পনা করতে গিয়ে বিশ্বসংসার তার চোখে মিথ্যা হয়ে যায়। না, আর সে সইবে না বিপিনের পাগলামি। এমনিই কখন কী হয় ঠিক নেই, ওর আবার দাঙ্গা থামাবার কাজে মাথা গলানো চাই, শান্তিসেনায় যোগ দেওয়া চাই, ইচ্ছা করে বিপদে ঝাঁপ দেওয়া চাই।

আজ বাড়ি ফিবুক, আর বেরোতে দেবে না। কাজে পর্যন্ত যেতে দেবে না, ছুটি নেওয়াবে। যায় তো যাবে কাজ। বিপিনকে ঘরের কোণে আটকে রাখবে। আড়াল করে রাখবে বুক দিয়ে।

ফেরার সময় পার হয়ে যায় বিপিন ফেরে না। সতীনাথকে একা আসতে দেখা যায়। মালতীর চোখ পথে পাতাই ছিল। কাজের পর বাড়ি ফিরলে ওর সঙ্গেই আসে বিপিন, কী গল্প করতে করতে আসে তাও তার জানা। বিপিন তাকে একসময় শোনাবেই প্রতিদিন, সতীনাথ কী বলছিল জানো ?...

বাইরের ধুলো-পড়া রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ায় মালতী। অদূরে গলির ওপাশে ছোটো বস্তিটি আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে। বর্ষা হয়ে যেদিন রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেছিল তারপর অনেকদিন পোড়া ঘর ধোয়া কালিমাতে রাস্তাটা কালচে দেখিয়েছে। প্রায় বছর ঘুরে এল বইকী। এমনি ভুলে থাকে মালতী বিপিনের চিন্তায় মশগুল হয়ে, কিন্তু ওই ভস্মস্তূপের দিকে চোখ পড়লেই তার মনে পড়ে যায় দিনদুপুরে সেই বীভৎস কোলাহল, আগুনের রক্তিম শিখা আর মন-প্রাণ চিরে চিরে দেওয়া অবর্ণনীয় আর্তনাদ। কেন তাকে দেখতে হয়েছিল সে দৃশ্য, শুনতে হয়েছিল সে আওয়াজ ! জগতে কত সুন্দর দৃশ্য আছে, কত মধুর ধ্বনি আছে, সে সবও তো সে দেখতে চায়নি, শুনতে চায়নি।

কী ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে হেঁটে আসছে সতীনাথ। তাকে রোয়াকে দেখেই মাথা নিচু করে চোখে পেতে রেখেছে পথে।

কাছে এসে চোখ তুলে তাকায় সতীনাথ। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কী হয়েছে বলুন। শিগগির বলুন।

সতীনাথ বলে, মালতী শোনে। মালতী আর্তনাদ করে ওঠে না, কাঁদে না, শব্দ করে না। সে নিজেই মিথ্যা অকারণ হয়ে গেছে, সব ফুরিয়ে গেছে তার। সে ঘর করত স্বামী আর এই আতঙ্ক নিয়ে, এই ছিল বিয়ের পর একবছর তার জীবনের অবলম্বন, তার বেঁচে থাকার মানে। এখন বিপিনও নেই, তার আতঙ্কও নেই।

চলুন যাই। দেখে আসি।

কী আর দেখবেন ? সতীনাথ ইতস্তত করে, ও না দেখাই ভালো।

আপনি চলুন তো। ও সব পরে বলবেন।

ভেতরে তবে একটা খবর দিয়ে আসি।

কে সঙ্গে যায়, কে যায় না, কে কাঁদে, কে কী বলে কিছুই খেয়াল থাকে না। কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছে তাও বুঝি তার মনে থাকে না। রাজপথের মানুষ তার মন হরণ করেছে। এই শহরের, এই বিষণ্ণ অভিশপ্ত শহরের পথেও এত মানুষ চলে, এ ব্যস্ততা দেখা যায় ! ডাইনের ওই গলির ভিতরটা যদি বা জনহীন শ্মশানের মতো বাঁয়ের গলিতে মানুষের চলাচল। এই রাজপথ জনমুখর, চোখেমুখে এত শঙ্কা নিয়ে কেন মানুষ বেরিয়েছে পথে ? কী এমন কাজ এদের যা করতেই হবে, যে জন্য বিপদকে মানতে পারছে না, প্রাণের ভয়কে অগ্রাহ্য করছে ? এদের ঘরে যে আবাগিরা আছে—

ওরা কী বলছে ? কীসের মিছিল ?

কে যেন জবাব দেয়, ওরা দাঙ্গা করতে মানা করছে। শান্তি প্রচারে বেরিয়েছে।

মালতী চেয়ে থাকে তফাতের গতিশীল ছেলেমেয়েদের দিকে, কান পেতে আওয়াজ শোনে। এগোতে এগোতে ক্রমে তারা কাছে আসে, আওয়াজ স্পষ্ট হয়, কথাগুলি তার মনের মধ্যে শত ধ্বনি সহস্র প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। এরা তার দুর্ভাগ্য ঠেকাতে বেরিয়েছে ? এরা বন্ধ করতে বেরিয়েছে তার সর্বনাশ ? এরা তার কাছে আবেদন জানাচ্ছে মরণ-যজ্ঞের আগুন নেভাতে এগিয়ে আসতে !

সঙ্গী ছাড়া হয়ে পায়ে পায়ে মালতী এগিয়ে যায়। ঠিক এই জন্য যেন সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, এমনি ভাবে শোভাযাত্রায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে ! মেয়েদের মধ্যে মিশে সে একাকার হয়ে যায় পর মুহূর্তে।

তথাকথিত

আধা সরকারি হাসপাতালের এল এম এফ ডাক্তার মতিলাল কুরিয়ে কুরিয়ে বাঁকা চোখে তাকায় সমবেত আরোগ্যপ্রার্থীদের দিকে। কী যেন ভেবেছে তাকে দশ গাঁয়ের লোকগুলি। বিনে মাইনেয় কেনা চাকর। সবাই ভিড় করে আসে হাসপাতালে, যার সর্দিকাশি, কাল যে মরবে—সবাই। বিছানা থেকে টেনে ওঠানোর জন্যই যে রোগীটার মরার সম্ভাবনা, তাকে পর্যন্ত তুলে আনে—বিনা পয়সায় তাকে দেখাতে, আর ফিকে রঙের জোলো ওষুধ নিতে। বেতন যা পায় যেন এরাই দেয় তাকে, দশগুণ উশুল করে নেবার দায়িত্বও যেন এরাই গ্রহণ করেছে কর্তব্য হিসাবে। কত সামান্য তার ফি, এরা মরণাপন্ন রোগীকে পর্যন্ত এক ক্রোশ পথ বয়ে আনবে সেই ফি ফাঁকি দিতে।

কথায় কথায় ধমকে ওঠে মতিলাল, পেটের পিলেটা একটু গুঁতিয়ে, জিভটা এক নজর দেখে, একটা কথা শুধিয়ে, ফসফস করে প্রেসক্রিপশন লেখে হাসপাতালের স্ট্যাম্প মারা ছোটো ছোটো কাগজের টুকরোয়। এ টিকিট একবার হারালে আর রক্ষা নেই। একদিন দু-চারঘণ্টা ধন্না দিইয়ে ফিরিয়ে দেবে পরদিন আসতে বলে—পরদিন এলে অন্য সকলকে দেখবার পর তার দিকে বিরক্তিভরা নজর পড়বে। কম শাস্তি দিয়ে গায়ের জ্বালা যদিও মতি ডাক্তারের এতটুকু কমে না, ওতে পয়সা নেই।

বাঁধা টাইমের এক মিনিট দেরি করে রোগী এলে সেদিন আর তার ভাগ্যে ওষুধ জোটে না।

দেড় কোশ হেঁটে এইছি বাবা।

দেড় কোশ হেঁটে, বাবাকে বলো গে।

কম্পাউন্ডার অবিনাশ মুচকে হাসে।

রোগী বেছে তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে মতি ডাক্তার, সযত্নে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে। গম্ভীর মুখে যতদূর সম্ভব ভড়কে দেয় রোগীকে আর তার সাথি যদি কেউ থাকে, গাল দেবার বদলে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীর মতোই বকুনি দেয় হাসপাতালে না আনার জন্য।

দিনরাত শুয়ে থাকবে। ওঠা একদম বারণ।

আজ্ঞে।

ঠিকমতো ওষুধ পড়া চাই আজ। কাল আবার দেখে ওষুধ পালটাতে হবে। বুঝলে তো? নড়াচড়া করলে বিপদ হবে—শুয়ে থাকবে, বিছানা ছেড়ে উঠবে না—খপর্দার। নাড়ি কাল দেখে নতুন ওষুধ দেব।

আজ্ঞে।

কিন্তু হায়রে! পরদিন হয় গোবুর গাড়িতে শুইয়ে রোগীকে হাসপাতালেই আনা হয়, নয় তো আত্মীয়স্বজন কেউ আসে রোগীর অবস্থার বিবরণ জানিয়ে ওষুধ নিতে।

না দেখে ওষুধ দেব কী করে?

আজ্ঞে যা হোক দিয়ে দ্যান।

যা হোক দিয়ে দেব? একি খেলা নাকি? তেমন ব্যারাম নয়, নিজে পরীক্ষা না করে ওষুধ দেওয়া যায় না। এক টাকা ভিজিট লাগবে, আট আনা সাইকেল।

আজ্ঞে, শুধিয়ে আসি তবে।

সেই যে যায়, আর ফিরে আসে না। তাকে দেড়টা টাকা দিয়ে বাড়িতে ডেকে দেখিয়ে ওষুধ না খাইয়েই কি বেঁচে যাবে রোগীটা, সেরে উঠবে? রোগী দেখা সাঙ্গ করে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে

জানালার ফাঁকে ওষুধের প্রত্যাশায় শিশি হাতে সারি বাঁধা অর্ধ উলঙ্গ মানুষগুলির দিকে শ্রান্ত চোখে তাকিয়ে মতি ডাক্তার ভাবে। একটু ভয়ও করে তার, এ সব কথা কর্তাব্যক্তিদের কানে গেলে আবার মুশকিল আছে। মানুষটা একটু ভীরুও বটে সে।

দুর্ভিক্ষেরা নিপীড়নে ভাঙাচোরা রুগ্‌ণ মানুষগুলি যেন তার জীবনের ব্যর্থতা আর হতাশার দায়িক—কী আছে ওদের যে সে আশা করবে কোনোদিন ওরা তাকে কিছু দেবে। হতভাগ্য দেশের হতভাগ্যদের মধ্যে পড়ে তারও বর্তমান ভবিষ্যৎ আঁধার হয়ে রইল। তাকে বাড়িতে ডেকে ফি দেবার ক্ষমতা আছে যে ভদ্রলোকদের, তারাও অল্পজ্বরে হাঁচি-কাশি পেট খারাপের ওষুধ নিতে হাসপাতালে আসবে, রোগ একটু কঠিন হলে ডাক্তার আনবে সদর থেকে। কদাচিৎ রাতবিরেতে হঠাৎ কিছু হলে অগত্যা তাকে ডাকা।

সেদিন সকালে ডাক এল চাটুজ্যে বাড়ি থেকে। বড়ো ছেলে ত্র্যম্বক এসেছে কলকাতা থেকে, তার পেটে ব্যথা। এখুনি একবার যেতে হবে ডাক্তারবাবুকে।

তা জানে মতিলাল। জরুরি না হলে দরকার কী তাকে হয় ! তবু চাটুজ্যেদের অবস্থা ভালো, গাঁয়ে প্রতিপত্তি আছে। হয়তো আজ তার চিকিৎসা দেখে এমন আস্থা আসবে যে ভবিষ্যতে ছোটো বড়ো সব রোগে তাকে একবার না ডাকলে মনটা খুঁতখুঁত করবে বাড়ির লোকের। আগ্রহ চেপে মতি ডাক্তার বলে, এত রোগী ফেলে—

তাড়াতাড়ি একবার আসতে হচ্ছে ডাক্তারবাবু !

হুকুমের মতো শোনায়। কিন্তু উপায় কী। চাটুজ্যেরা বড়োলোক, তাদের প্রতিপত্তি আছে।

ত্র্যম্বক ছিল কলকাতায়। মনোহর সুঠাম চেহারার দায়ে জীবনটা অপচয় করার উৎসাহে বেসামাল হয়ে ত্রিশে পা দেবার আগেই তার সব ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন শুধু জের টেনে চলার ব্যর্থ চেষ্টার নেশা। শুধু কল্পনা করা তাদেব, যাদের চোখের আয়নায় তাকে দেখার প্রতিক্রিয়ায় নিজেকে দেখে মনে হত, আর কী চাই ! একনজর দেখলেই আজ বোঝা যায় দেহটাই শুধু ধ্বংস হয়ে যায় নি, জীবনের স্বাদগন্ধও কিছু অবশিষ্ট নেই। বছর ত্রিশেক বয়সে।

কী রেটে নিজেকে সে খরচ করেছে মতি ডাক্তার তা আন্দাজ করতে পারে।

আরেকটা রোগ হওয়ায় কী ভেবে চলে এসেছে দেশের বাড়িতে। রোগটা বিশ্রী, লিভার বিগড়ে গিয়ে পৃথিবীর সব কিছু হলদে করে দেয়, চোখের আলো পর্যন্ত। চামড়া হলদে হয়ে যায় হলুদবাটা কোমল হাতগুলির মতো।

কড়া একটা ইনজেকশন দিন—ওপিয়াম টোপিয়াম যা আছে।

ইনজেকশন দরকার নেই। একটা বড়ি দিচ্ছি, খান।

বড়ি টড়ি রাখুন—ডবল ডোজ ইনজেকশন দিন। ইনজেকশন দেবার— ? সংশয় ভরে তাকায় ত্র্যম্বক।

সব আছে মশাই, সব আছে। মতি ডাক্তারের এখন সীমাছাড়ানো গাম্ভীর্যপূর্ণ নাটকীয় আত্মবিশ্বাস, যেন দ্বিতীয় বি সি রায়,—ইনজেকশনের চেয়ে বড়িতে তাড়াতাড়ি কাজ দেবে। আমি ডাক্তার, আমি বলছি, কথা শুনুন। ব্যথাটা আপনার পেটে—কলিকও নয়। ইনজেকশন দিয়ে নার্ভ অবশ করে ব্যথা কমাতে যত সময় লাগবে, ওষুধটা পেটে গেলে তার চেয়ে তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

ব্যথাতুর হয়ে ত্র্যম্বক সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে বলে, বলেন কী !

তা ছাড়া, আপনার এই কন্ডিশনে ইনজেকশন আমি দিতে পারব না। সদর থেকে বড়ো ডাক্তার ডাকুন।

দিন যা দেবেন।

দুটো বড়ি জলে গুলে তাকে খাইয়ে দিল মতিলাল। ব্যথা-বেদনার প্রতিকাররূপে এই বিষাক্ত বড়িগুলি বিখ্যাত, ত্রম্বকও নাম জানে, ব্যবহার করেছে। মতিলালের রকমসকমে মনে হল, এগুলি যেন তারই বিশেষ আবিষ্কার। ত্রাম্বকের অবস্থা বিবেচনায় একটা বড়ির বেশি এ বিষ দেবার সাহস অন্য ডাক্তারের হত না। মতিলালেরও বুকটা একটু কাঁপছিল। দশ মিনিটের মধ্যে ত্রাম্বক ঘুমিয়ে পড়ল। বিকালে আবার এল মতি ডাক্তার।

কলকাতায় থাকাই আপনার উচিত ছিল, মতি ডাক্তার জানাল, শুধু জন্ডিসের চিকিৎসা নয়, অনেকদিন ধরে আপনার চিকিৎসা দরকার।

চিকিৎসায় কিছু হবে না। ব্যথাটা একটু কমিয়ে দিন, তাতেই হবে এখনকার মতো।

এ মরা মানুষের কথা। মতিলাল সবিনয়ে হাসল। মনে তার গড়ে উঠেছিল পরিকল্পনা, অসাধ্য সাধনের চেষ্টার আর মোটা কিছু উপার্জনের।

আজ্ঞে, তা বলবেন না। কোনো কোনো রোগ আছে, যার চিকিৎসা নেই,—সাধারণ স্বাস্থ্যহানি সব অবস্থায় সারিয়ে দেওয়া যায়।

স্বাস্থ্যহানিটা সাধারণ দেখলেন নাকি ? বিষণ্ণভাবে হাসে ত্রাম্বক, কিছু বুঝি বাগাতে চান ? কিন্তু আমায় ভোলাতে পারবেন না। কলকাতার বড়ো বড়ো ডাক্তাব পাবেনি।

মতি ডাক্তার ব্যথিত কণ্ঠে বলল, ডাক্তাবকে ফি নিতে হয় বাঁচাব জন্যে, ডাক্তার চিকিৎসা বেচে না মশায়। আমি কলকাতার ডাক্তার নই। ফি-র কথা আমি ভাবিনি। ভাবছিলাম, আমি গাঁয়ের ডাক্তার, আমার চিকিৎসায় কি আপনাদের বিশ্বাস হবে ?

ত্যাবচা মন অকারণে খোঁচা দিতে পারে অনায়াসেই, কিন্তু আঘাত করা হয়েছে টের পেলেই, অস্বস্তিতে নেতিয়ে যায়। ত্রাম্বক ব্যস্ত হয়ে বলে, না না তা নয়, তা নয। বিশ্বাস হবে না কেন ?

সেদিন ওই পর্যন্ত। পরদিন মতি ডাক্তার আবাব কথাটা তুলল। অনেক ভণিতা করে জানাল যে ত্রাম্বক যদি তাকে সুযোগ দেয়, সে তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল কবে তোলার দায়িত্ব নিতে বাজি আছে। ফি সে এক পয়সা এখন নেবে না, ত্রাম্বক ভালো হয়ে ওঠার পর সে প্রশ্ন উঠবে।

আগের মতো হব ?

না। মতিলাল জোর দিয়ে বলল, না। যে বযস যায, যে তেজ যায, তা কি ফেবে ? তবে শরীরে আপনার গ্লানিবোধ থাকবে না, দুর্বলতা থাকবে না। লোকে দেখে টের পাবে না দেহটা আপনাব ভেঙে পড়েছিল।

খানিকটা খেলাব ছলেই যেন রাজি হয় ত্রাম্বক।

করুন চিকিৎসা। যদি পারেন, আপনাকে হাজার টাকা দেব।

একটু যদি লিখে দ্যান, মতি ডাক্তার সবিনয়ে ভিক্ষা চাওযার মতো বলে, এক বছব দু বছব লাগবে, একটা লিখিত কন্ট্রাক্ট থাকলে মন্দ হয় না। এও নয় লিখে দিন যে, আপনাব খুশি হলে দেবেন, খুশি না হলে দেবেন না, আমার কোনো দাবি থাকবে না। কথাটা বললেন, একটু শুধু লিখে দিন, ভুলে টুলে গেলে মনে পড়বে এই আর কী !

মিছেমিছি কষ্ট করবেন ডাক্তারবাবু। কিছু হবে না।

আপনি ভালো হয়ে যাবেন।

এই না বলে মতি ডাক্তার কোমর বেঁধে লেগে গেল ত্রাম্বককে ভালো করতে, একটা মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে। রোজ সে আসে চাটুজ্যে বাড়িতে, রোগ সে ব্যবস্থা দেয এটা করুন ওটা করুন, এটা খান ওটা খান, এ থেকে বিরত হোন, ও সব স্থগিত রাখুন। কিছু মানে ত্রাম্বক, কিছু মানে না। মতি ডাক্তার অসহ্য হয়ে ওঠে তার কাছে। সেটা টের পেয়ে মতিলাল দু-চারদিন ধারে কাছে ভেড়ে না, অদৃশ্য হয়ে থাকে।

দু-চারদিন ধারে কাছে না ঘেঁষলে একটু যেন ত্র্যম্বক মতি ডাক্তারের সঙ্গ চায়, তার ফেনানো ফাঁপানো মিথ্যা আশা আশ্বাস ভরসার কথাগুলি শোনার প্রয়োজন বোধ করে, বেশির ভাগ না মানলেও তার নির্দেশ উপদেশ ব্যবস্থার কথা শুনতে বেশ একটু ইচ্ছা জাগে ! ভাঙা মানুষ মরা মানুষ তো এতখানি হতাশ হতে পারে না যে, কেউ তাকে জোড়া দেবার বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে জেনেও চুপচাপ মুখ গুঁজে মরবে ! নির্ভীক বেপরোয়া আশ্বাসের মতো সঞ্জীবনী আর কিছু নেই। তাই না জগতের ডাক্তাররা মুমূর্ষুর দেহে সুনিশ্চিত মরণকে প্রত্যক্ষ দেখেও বলে, ভয় কী, সেরে উঠবেন।

একটা সুবিধা হয়েছে মতি ডাক্তারের। জন্ডিস কাবু করেছে বটে ত্র্যম্বককে, আবার সেই সঙ্গে বিস্বাদ বিশ্রী করে দিয়েছে সিগারেট থেকে তার সব নেশা। নতুন বিষ শরীরে আনা ঠেকানো গেছে সহজেই।

একজনকে আশা আশ্বাস দিতে দিতে একটি ঝলসানো জীবনকে পাপমুক্ত করার সাধনায় টাকা আর পশারের লোভেই মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে আশ্চর্য এক আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠতে থাকে মতি ডাক্তারের মধ্যে, এতদিনের শ্রান্ত হতাশ জীবনের রূপ বদলে যেতে থাকে অদ্ভুতরকম।

অন্তর যেন নতুন এক ভাষায় গুঞ্জন করে বলে যে, টাকা তো আসবেই, পশার তো হবেই, কিন্তু কী হবে সে টাকা আর পশার যদি না—

যদি না কী ? সেটা কোনোমতেই স্পষ্ট হয় না গাঁয়ের আধা সরকারি হাসপাতালের এল এম এফ ডাক্তার মতিলালের কাছে ! শুধু মনে হয় আরও কতগুলি কিছু না হলে, যেখানে যাদের মধ্যে যা কিছু নিয়ে বসবাস ও জীবনযাপন তার মধ্যে কিছু সামঞ্জস্য কিছু সার্থকতা না এলে, শুধু নিজের টাকা আর পশার নিয়ে বুঝি সে রকম খুশি হওয়া যাবে না !

বাঁধা টাইমের পরে যে রোগী আসে তাকে আজও ধমক দেয় মতি ডাক্তার কিন্তু কেন যেন ব্যঙ্গাত্মক গালটা আসে না।

বলে, বাপু তুমি কি চাকর রেখেছ হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে ? যখন খুশি আসবে আর হুকুম দেবে ওষুধ দিতে ?

দেড় কোশ হেঁটে এইছি বাবা !

দেড় কোশ হেঁটে যাও। কাল ফের দেড় কোশ হেঁটে এসো সময়মতো। তোদের জন্য মরব নাকি আমি ? আয় ইদিকে, চটপট আয়। ব্যাটার নড়তে লাগে দশ ঘণ্টা। জিভ বার কর।

সে বেচারা কাতর হয়ে বলে, কর্তা, মরণ ভালো ছিল মোর।

মতি ডাক্তার গ্রাহ্য করে না, বলে, জ্বর কদ্দিন ?

আজ্ঞে চলছে ঘুষঘুষ ঢের দিন থে।

কাশি আছে নাকি ?

আছে।

রক্ত পড়ে ?

একটু একটু পড়ে আজ্ঞে।

তার দিকে চেয়ে থাকে মতি ডাক্তার। ছেঁড়া লুঙ্গি পরা খালি গা একটা জ্যান্ত ভূত, পেট ভরে দুবেলা ভাত জোটে না, তার এই রাজকীয় রোগের এখন কী চিকিৎসার ব্যবস্থা সে করে, কী ওষুধ দেয়। রাজা-টাজা হলে নয় বলে দেওয়া যেত মাসখানেক দুধ ঘি মাছ মাংস আঙুর বেদানা খেয়ে এস ওষুধ নিতে।

খাটো কোথা ?

সদরের কাপড় কলে। শরীরে বয় না তাই দেশের ঘরে এলাম যে জ্বরটা যদি ছাড়ে, দেহটা যদি সারে।

বেশ করেছ। দেশে ঘরে মরেও সুখ আছে।

চোখে যেন জল এসে যায় মতি ডাক্তারের। তিন ছেলের মা তার বউ, মেয়েলি রক্তপাতের রোগে সে মরোমরো। একটা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার সে, নিজের স্ত্রীর চিকিৎসার উপায় জানে, ব্যবস্থা জানে না। তবু ওষুধ খাওয়ায় স্ত্রীকে, হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধ। একেও ওষুধ লিখে দিতে হবে তাকে, এও শিশি ভরে নিয়ে গিয়ে খাবে হাসপাতালের বিনা পয়সার ওষুধ। সবাই যদি এমনি ভাবে ভোগে, কী করবে সে ত্র্যম্বককে ভালো করে তুলে ?

ত্র্যম্বকের রক্ত পরীক্ষা হতে যায় কলকাতায়, ওষুধ আসে কলকাতা থেকে, দুষ্প্রাপ্য ফুড, দামি ফল। মতিলাল রুগ্‌ণা স্ত্রীর শিয়রে বসে আবার ডাক্তারি বই ঘাটে, ত্র্যম্বকের দেহ থেকে পুরানো রোগের দুর্ধর্ষ জীবাণু তাড়াবার চেষ্টা কতদূর এগোল সযত্নে হিসাব করে, ছোট্ট খাতাটিতে লিখে রাখে কবে ইনজেকশন দেওয়া হল, কটা হল। হাসপাতালের স্টকে এ সব ওষুধ নেই, যুদ্ধ কিন্তু এই গাঁয়ে পর্যন্ত এনে দিয়েছে ওই রোগের অভিশাপ। অন্য অসুখের চিকিৎসা করাতে আসে, চেপে ধরলে, আশ্বাস দিলে, বুঝিয়ে বললে, অনেক টালবাহানার পর স্বীকার করে। পুরানো দিনের দীর্ঘ ক্লান্তিকর চিকিৎসার ব্যবস্থা ওদের জন্য—সে ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ নেই হাসপাতালে, জোড়াতালি দিয়ে চালাতে হয়। ত্র্যম্বকের চিকিৎসা করতে আনন্দ পায় মতি ডাক্তার। সে যেন ভুলে যায় সে পাড়াগাঁয়ের অর্ধশিক্ষিত এল এম এফ ডাক্তার, মনে হয় সে যদি সব সরঞ্জাম পেত, ওষুধ আর পথ্য, রোগ সে নির্মূল করে দিতে পারত দেশ থেকে !

আশার সঞ্চারে জীবনের প্রতি প্রকাশ্য মমতা লক্ষ করা যায় ত্র্যম্বকের মধ্যে, তীব্র অভিমানী অবহেলার ভাব কেটে যাচ্ছে। চিকিৎসা সম্পর্কে তার আগ্রহ এসেছে। আশা করতে আরম্ভ করায় এদিকে আবার আশঙ্কাও তুচ্ছ হয়ে নেই যে সত্যসত্যই কি সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া যাবে ?

বলে, কলকাতার কাউকে কনসাল্ট করা দরকার মনে করেন কি ?

আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না ?

না না, তা নয়। আপনি দরকার মনে করেন নাকি জিজ্ঞেস করছিলাম।

বলে, ফি র কিছুটা আপনি নিন ডাক্তারবাবু। অনেক খাটছেন।

আপনার খুশি !

দুশো টাকার নোট ত্র্যম্বক মতি ডাক্তারের হাতে তুলে দেয়, সে সত্যই কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল। রাত-দুপুরে মতি ডাক্তার বিছানা ছেড়ে ওঠে। আলো জ্বেলে বাক্‌সো খুলে নোটের তাড়াটা আরেকবার হাতে নেয়। এগারো বছর সে ডাক্তারি করছে, আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো রোগীর কাছ থেকে এক সাথে পাঁচটা টাকা ফি পায়নি। জীবিকার জন্য ডাক্তারি শেখার এই প্রথম বাস্তব অর্থ, রূপ ধরা সার্থকতা। কিন্তু তেমন সুখ হচ্ছে কই, আহ্লাদ ?

হাসপাতালের বিনা পয়সার ডাক্তার হিসাবে ছাড়া তার আসল রোগীদের মধ্যে এতটুকু পশার তার বাড়েনি, ওদের কাছ থেকে মাসে পনেরোটা টাকাও আসে না। ওদের দেওয়ার ক্ষমতা না বাড়লে কোনোদিন যে তা আসবে সে ভরসাও নেই, সবার অবস্থা বরং আরও শোচনীয় হচ্ছে ক্রমে ক্রমে। তার চেনা অখিল প্র্যাকটিস করে সদরে, যুদ্ধের বিপর্যয় ত. ক কোনো রকমে দিন চলার অবস্থা থেকে 'কল'-এর চাপে নাওয়া খাওয়ার সময় না পাওয়ার অবস্থায় এনে দিয়েছে, ফি ডবল করা সত্ত্বেও ! কারণ ? দেওয়ার ক্ষমতা বেড়েছে শহরের মানুষের ! আর সে যাদের ডাক্তার, যারা তার আসল পশারের একমাত্র আশা ভরসা, তারা দলে দলে উৎখাত হচ্ছে জমি থেকে, একটা টাকা এমনি নিত্যকার বেঁচে থাকার জরুরি দরকারে না লাগিয়ে তাকে দিয়ে বাঁচার চেষ্টার মানেই খুঁজে পাচ্ছে না।

স্ত্রী বলে, কী হল ?

মতি ডাক্তার বলে, না কিছু না। ভাবছিলাম ফি আরও কমিয়ে দেব নাকি।

রাত দুপুরে মতি ডাক্তার ফি কমিয়ে পশার বাড়াবার কথা ভাবছে, ফি-র দুশো নগদ টাকা হাতে নিয়ে !

স্বাস্থ্যের পরিবর্তন স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে ত্র্যম্বকের, সেই সঙ্গে মনেরও। বছর খানেক পরে সত্যসত্যই তাকে মানুষের মতো দেখায়, মানুষের মতোই মনে হয় তার কথাবার্তা চালচলন ব্যবহার। ঘোলাটে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এসেছে, জোর বেড়েছে মনের। তবে তখনও বাকি থাকে মেরামতের কাজ, এক যুগ ধরে উদ্দাম উল্লাসে যা চুরমার করা হয়েছে ভেঙে ভেঙে, একটা বছরে তা কি সম্পূর্ণ মেরামত হয় ? বর্ষা উন্নতি ব্যাহত করে, একটু তাকে কাবু করে রেখে যায়। বর্ষার সময়টা পশ্চিমে কোথাও চেঞ্জে যাবার কথা তোলে মতি ডাক্তার, ত্র্যম্বক রাজি হয় না। বেশি দিনের জন্য মতি ডাক্তারকে ছেড়ে দূরে থাকার মতো মনের জোর তখনও তার আসেনি।

সমাজ সংসার অল্পে অল্পে মনটা আকর্ষণ করছে ত্র্যম্বকের। পারিবারিক ব্যাপারে বিদ্বেষী উদাসীনতা নেই, ফাল্গুনে বোনের বিয়ের নামেই কলকাতা পালানোর বদলে দায়িত্ব নিয়ে খেটে খুটে অনেকটা রেহাই দিল বুড়ো দেবেন চাটুজ্যেকে। জোতজমি বিষয়কর্মও সে দেখা শোনা আরম্ভ করেছে, অবাধ্য প্রজাকে নাকে খত দেওয়াতে কান মলাতে উৎসাহ বোধ করছে।

দেবেন চাটুজ্যে সদয় ব্যবহার করছে মতি ডাক্তারের সঙ্গে। কল টিপে তার দশ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে, পাল-পার্বণে তাকে ডেকে নেমন্তন্ন খাওয়ায়, মাঝে মধ্যে মাছটা ফলমূলটা পাঠিয়ে দেয় তার বাড়িতে। বিশেষ কৃতজ্ঞ সে অবশ্য নয়, হাসপাতালের ডাক্তার চিকিৎসা করেছে ছেলের তাতে কৃতজ্ঞতার প্রশ্ন কী থাকতে পারে। একেবারে হাজার টাকা ফি দেবার কথাটা বরং তাকে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ করে রেখেছে। কাণ্ডজ্ঞান কোনোদিনই ত্র্যম্বকের ছিল না, বিনা পয়সায় চিকিৎসা করারই যার কথা, তাকে একেবারে হাজার টাকা কবুল করার কোনো মানে হয় ? গোড়ায়, ছেলের সম্পর্কে যখন কোনো আশা-ভরসাই ছিল না, তখন কেন প্রতিবাদ করেনি সে কথা কেউ অবশ্য তাকে জিজ্ঞাসা করে না।

বৈশাখে ছেলের বিয়ে দেব ভাবছিলাম মতিলাল। একটি বড়ো-সড়ো সুন্দরী মেয়ে পেয়েছি, ম্যাট্রিক পাশ দিয়ে আই এ পড়ছে। বত্রিশ চলছে ছেলের, বয়স হয়ে গেল—

আজ্ঞে সে তো ভালো কথা। তবে কি না, আরও মাস ছয়েক—

তাই ভালো। বৈশাখে থাক, অগ্রানেই শুভকর্ম সারা যাবে।

ত্র্যম্বক সম্পর্কে মতি ডাক্তারের কথা অগ্রাহ্য করার ভরসা দেবেনের নেই, ত্র্যম্বকের নিজেরও নেই—এখন পর্যন্ত !

মতিলাল সগর্বে লক্ষ করে তার মৃত রোগীটির মুখে চোখে নতুন স্বাস্থ্যের জ্যোতি, তার অর্থহীন জীবনে নব নব উদ্দেশ্য উপচারের সমাবেশ। টাকা সে আরও দেড়শো পেয়েছে দু দফায়, একবার একশো, পরের বার পঞ্চাশ। চাইতে হয়েছে দুবারই। শেষবার একটু বিব্রত, একটু অসন্তুষ্ট মনে হয়েছে ত্র্যম্বক আর দেবেন দুজনকেই।

অন্য প্রসঙ্গে কথাচ্ছলে দেবেন জানিয়েছে, মাইনে তোমার দশ টাকা বাড়ল হে, আমি না উঠে পড়ে লাগলে আর কারও সাধ্যি হত না বোর্ডকে রাজি করায়।

হাজার টাকার আর কতটা আদায় করা যাবে, একটু খটকা জেগেছে মতি ডাক্তারের মনে ! জীবনে অনেক পাওনাই আদায় হয় না মানুষের।

এদিকে ফি সে কমিয়ে দিয়েছে গরিবদের জন্য। সাইকেলের জন্য চার আনা বাঁধা, ওটা দিতেই হবে সকলকে, তার ওপর চার আনা আট আনা যে যা পারে দেবে। আরও গরম হয়েছে তার ব্যবহার রোগীদের সঙ্গে—শত্রুভাবে নয়, বন্ধুভাবে, আত্মীয়তাবোধের তাপে। ধমক আর বকুনি তার চলে অনর্গল, রোগীরা যেন খুশি হয়, স্বস্তি বোধ করে।

বাপকে মেরেছ রক্ত বমি করিয়ে, কাঁথা জড়ানো নুরুলের জ্বর দেখে পেটের পিলেটা টিপতে টিপতে বলে, চার জ্বর নিয়ে তুমি এসেছ পিলে ঠাসা দশ মাসের গভ্‌ভো দেখাতে। ফের যদি জ্বর গায়ে হাসপাতালে আসবি হারামজাদা, তোর পিলে আমি অপারেশন করে কাটব।

ধুঁকতে ধুঁকতে নুরুল মরার মতো হাসে।

আট গন্ডা পয়সা জোগাড় রাখবি, আঙুল তুলে শাসিয়ে বলে, চার আনা সাইকেল, চার আনা ফি। কাল জ্বর ছাড়লে গিয়ে গা ফুঁড়ে ওষুধ দিয়ে আসব।

অঘ্রানে বিয়ের সাতদিন আগে থেকে সানাই পোঁ ধরেছে দেবেনের বাড়িতে। মাঠে বিবাদ বেধেছে ধানের ভাগ নিয়ে, ধান কেটে চাষির ঘরে তোলা নিয়ে চাষি আর জোতদারে। আহত লেঠেল কজন জড়ো হয়েছে দেবেনের বাড়িতে, ঘন ঘন লোক যাচ্ছে হাসপাতালে মতি ডাক্তারকে ডেকে আনতে। ত্র্যম্বকেব হাতেও একটু চোট লেগেছে। মানুষ তাকে সত্যই করে দিয়েছে মতি ডাক্তার চিকিৎসা করে, এমনই বেড়েছে তার তেজবীর্য যে নিজে লাঠি ধরে সে লোকজনের সঙ্গে গিয়েছিল বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে, তারই লাঠি আচমকা প্রথম আঘাত হানে, ঘায়েল করে ফেলে দেয় নুরুলকে।

মতি ডাক্তারের পাত্তা নেই। আহত চাষিদের ব্যান্ডেজ বাঁধতে ওষুধ দিতে সে ব্যস্ত— হাসপাতালের ব্যান্ডেজ হাসপাতালের ওষুধ, যে হাসপাতাল আধা-সরকারি, যে হাসপাতালের বোর্ডে আছে দেবেন চাটুজ্যে নিজে !

কাতরাতে কাতরাতে চোখ মেলে মতি ডাক্তারকে চিনতে পেরে নুরুল দাঁত বের করে একটু হাসে। তার হাড়-পাঁজরা খানিকটা ঢাকা, পেটের পিলেটা ছোটো হয়ে গেছে। ত্র্যম্বকের মতো তাকেও একরকম মানুষ করেছে মতি ডাক্তার, দামি দামি ওষুধপত্র ছাড়াই, শুধু গা ফুঁড়ে কুইনিন দিয়ে আর কুইনিন খাইয়ে।

তোকে কে লাঠি মারলে রে ? দেবেনবাবুর ছেলে ? বেশ ! বেশ ! সকৌতুকে সায় দিয়ে দিয়ে মতিলাল মাথা নাড়ে, দেখলি তো মতি ডাক্তারের হাতযশ ? কলকাতাব ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছিল, এই মতি ডাক্তার ভালো করেছে দেবেনবাবুর ছেলেকে। লাঠির ঘায়ে তোকে আজ কাবু করে !

হাসপাতালে ফিরতেই দেবেনের লোক বলল, কোথা গিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু ? শিগগির আসুন, কর্তা ডাকছেন।

দাঁড়াও বাপু দাঁড়াও। একটু জিরিয়ে নিই।

যেতে হবে। হাজার টাকার সাতশো টাকাই এখনও বাকি !

কিন্তু না গিয়ে যদি চলত ? যদি মরতে দেওয়া যেত ওদের সব কটাকে বিনা চিকিৎসায় ? তার হাতযশ ত্র্যম্বককে পর্যন্ত ?

ছেলেমানুষি

ব্যবধান টেকেনি। হাত দুই চওড়া সরু একটা বন্ধ প্যাসেজ বাড়ির সামনের দিকটা তফাত করে রেখেছে, দু বাড়ির মুখোমুখি সদর দরজাও এই প্যাসেজটুকুর মধ্যে। পিছনে দু বাড়ির ছাদ এক, মাঝখানে দেয়াল উঠে ভাগ হয়েছে, মানুষ-সমান উঁচু। টুল বা চেয়ার পেতে দাঁড়ালে বড়োদের মাথা দেয়াল ছাড়িয়ে ওঠে।

ব্যবধান টেকেনি। কতটুকু আর পার্থক্য জীবনযাপনের, সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আশা-আনন্দের, ঘৃণা-ভালোবাসার। সকালে কাজে যায় তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন, অপরাহ্নে ফিরে আসে অবসন্ন হয়ে। ব্যর্থ স্বপ্ন উৎসুক কল্পনা দিন দিন জমে ওঠে একই ধরনের, ক্ষোভ দিনে দিনে তীব্র হয় দুটি বুকে একই শক্তির বিরুদ্ধে। ইন্দিরা আর হালিমা যাপন করে বন্দী জীবন,—রাঁধে বাড়ে বাসন মাজে স্বপ্ন দেখে আর অকারণ আঘাত মুখ বুজে সয়ে চলে অবুঝ নিষ্ঠুর সংসারের। ইন্দিরার কোলে একদিন আসে গীতা। পরের বছর অবিকল তারই বেদনাকে নকল করে হালিমা পৃথিবীতে আনে হাবিবকে।

যদিবা টিকতে পারত খানিক ব্যবধান, দুরন্ত দুটি ছেলেমেয়ে মানুষের তৈরি কোনো কৃত্রিম দূরত্ব মানতে অস্বীকার করে তাও ভেঙে দেয়। কাছে আনে পরিবার দুটিকে। অন্তরঙ্গ করে দেয় ইন্দিরা আর হালিমাকে।

একদিন একটি শুভলগ্নে দুটি ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় পাড়ায়। গীতা পায় নতুন খেলা। মার শাড়ি ভাঁজ করে সে পরে, সিঁদুরের টিপ আর চন্দনের এলোমেলো ফোঁটা আঁকে কপালে আর গালে, পাড় দিয়ে বাবার লাল টুথব্রাশটির মুকুট এঁটে সে কনে সাজে হাবিবের। কপালে চন্দন লেপে গলায় গামছা পাকানো উড়ুনি ঝুলিয়ে দিয়ে হাবিবকে বরবেশে সেই সাজিয়ে দেয়। শাশুড়ির অভিনয় করতে হয় ইন্দিরা আর হালিমা দুজনকেই। উলু দিয়ে বরণ করতে হয় জামাইকে ইন্দিরার, বউকে হালিমার। খাবার আনিয়ে জামাই-আদরে বউ-আদরে দুজনকে খাওয়াতে হয় মুখে খাবার তুলে দিয়ে। নইলে নাকি খায় না নতুন বর-বউ। থেকে থেকে দুজনে তারা ফেটে পড়ে কৌতুকের হাসিতে। তাতে রাগতে রাগতে হঠাৎ বিয়ের কনের লজ্জা-শরম ভুলে গিয়ে মেঝেতে হাত পা ছুঁড়ে কান্না শুরু করে গীতা। তারপর থেকে তাদের হাসতে হয় মুখে আঁচল গুঁজে।

মাকে নকল করে গীতা হাবিবকে ডাকে, ওগো ? ওগো শুনছ ? জামাই। এই জামাই। ডাকছি যে ?

হাবিব বলে, অ্যাঁ ?

অ্যাঁ কি ? অ্যাঁ না। বলো, কিগো ?

হালিমা আর ইন্দিরা ঢলে পড়ে পরস্পরের গায়ে।

মুখ ভার করে থাকে পিসি। হালিমা বাড়ি ফিরে যাওয়ামাত্র বলে, এ সব কী কাণ্ড বউমা ?

কেন পিসিমা ?

চা খাওয়ালে, বেশ করলে। তা চা যে খেয়ে গেল কাপে মুখ ঠেকিয়ে কাপটা শুধু ধুয়ে তুলে রাখলে সব বাসনের সাথে ? গঙ্গা জলের ছিটেও দিতে পারলে না ? ভিন্ন একটা কাপ রাখলেই হয় ওর জন্যে। জাতধম্মো রইল না আর।

গঙ্গা জলে ধুয়েছি। —ইন্দিরা অনায়াসে বানিয়ে বলে।

এ বাড়িতে নাসিরুদ্দীনের মায়েরও মুখ ভার।

ও বাড়ি থাকলেই পারতে ? এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। ওরা পছন্দ করে কিনা কে তা জানে।

হালিমাও হাসি মুখেই বলে, চা না খাইয়ে ছাড়লে না। দেরি হয়ে গেল।

তুমি তো খেয়ে এলে চা খুশি মনে। তুমি দিয়ো তো একদিন কেমন খায় ?

চা তো খায় !

সব কাজ পড়ে আছে সংসারের, সময় মতো শুবু হয়নি। নাসিরের মার আসল রাগ কেন হালিমা জানে, তাই জবাব দিতে দিতে সে চটপট কাজে লেগে যায়। বিশেষ কিছুই আর শুনতে হয় না তাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যায় ছোটো নাতনিকে কোলে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীনের মা আর ছোটো নাতি কোলে প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তারাপদর পিসি গল্প জুড়েছে সুখদুঃখের !

ব্যবধান টেকেনি।

কাজ সেরে দুপুরে হালিমা যেদিন একটু অপরাধিনীর মতোই এসে বসে, সেদিনও নয়। মৃদু অস্বস্তির সঙ্গে বলে হালিমা, একটা কাণ্ড হয়েছে ভাই।

ওমা, কী হয়েছে?

তোমার মেয়ে একটু গোস্ত খেয়ে ফেলেছে। আজ আমাদের খেতে হয় জানো। হাবিব খেতে বসেছে, আমি কিছুতে দেব না, বেটি এমন নাছোড়। হঠাৎ পাত থেকে নিয়ে মুখে পুরে দিলে।

কিছু হবে না তো ? ইন্দিরা বলে চমকে গিয়ে।

হালিমার মুখ দেখে তারপর ইন্দিরা হাসে, বলে, কী যে বলি আমি বোকার মতো। হাবিবের কিছু হবে না, ওর হবে ! খেয়েছে তো কী আর হবে, ওইটুকু মেয়ে। কাউকে বোলো না কিন্তু ভাই।

তাই কি বলি ? হালিমা স্বস্তি পায়— বাব্বা ; আমি জানি না ? ও রোজ আলি সাব আর তার বিবি এসে কী দাবড়ানি দিয়ে গেল। হাবিব তোমাদের সরস্বতী পুজোয় অঞ্জলি দিয়েছে, প্রসাদ খেয়েছে, এ সব কে যেন কানে তুলে দিয়েছিল।

শোনো বলি তবে তোমায় কাণ্ডখানা।—ঘরে কেউ নেই, তবু ইন্দিরা কাছে সরে নিচু গলায় বলে, হাবিব অঞ্জলি দিয়েছে বলে পিসির কী রাগ ! উনি শেষে পঞ্জিকা খুলে আবোল-তাবোল খানিকটা সংস্কৃত আউড়ে পিসিকে বললেন, সরস্বতী পুজোয় দোষ হয় না, শাস্ত্রে লিখেছে। তখন পিসি ঠান্ডা হয়ে বললে, তাই নাকি !

শান্ত দুপুর। ফিরিওলা গলিতে হেঁকে যাচ্ছে, শাড়ি-শায়া-শেমিজ চাই। দুজনে তারা খড়ি নিয়ে মেঝেতে কাটাকাটি খেলতে বসে। হাই ওঠে, বুজে আসে চোখ। চোখে চোখে চেয়ে ক্ষীণ শ্রান্ত হাসি ফোটে দুজনের মুখে। আঁচল বিছিয়ে পাশাপাশি একটু শোয় তারা দুটি স্ত্রী, দুটি মা, দুটি রাঁধুনি, দুটি দাসী।

ঘুমোয় না। সে আরামের খানিক সুযোগ জোটে বেলা যখন আরও অনেক বড়ো হয় গরমের দিনে। আজকাল শুধু একটু ঝিমিয়ে নেবার অবসর মেলে। ঝিমানো চেতনায় ঘা মারে স্তব্ধ দুপুরের ছাড়াছাড়া শব্দগুলি। তার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট হতে থাকে ছাতে হাবিব আর গীতার দাপাদাপির শব্দ।

ব্যবধান টেকেনি। কেন যে সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আচমকা এমন ভয়ানক এমন বীভৎস রূপ নিয়ে, কেন এত হানাহানি খুনোখুনি চারিদিকে বোঝে না তারা, থতোমতো খেয়ে ভড়কে যায়, দুরদুর করে বুক। সেবার মাঝে মাঝে বুক কেঁপেছিল সাইরেনের আওয়াজে জাপানি বোমার দিনগুলিতে, দূর থেকে হাওয়ায় ভর করে উড়ে আসা অনিশ্চিত বিদেশি বিপদের ভয়ে। তার চেয়ে ব্যাপক, ভয়ানক সর্বনাশ আজ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের বুকে, শহর জুড়ে, পাড়ায়, ঘরের দুয়ারে। বুকের জোরালো ধড়ফড়ানি থামবার অবকাশ পায় না আজ, বাড়ে আর কমে, কমে আর বাড়ে।

তবে কথা এই যে, এটা মেশাল পাড়া। নিজেরাই বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে যতটা নিরুপায় নয় তার চেয়ে অনেক বেশি মরিয়ার মতো। এতেই অনেকটা ভরসা খাড়া আছে মারাত্মক আতঙ্ক গুজব আর উসকানির সোজাসুজি প্যাঁচালো আর চোরাগোপ্তা আঘাত সয়ে, যে আঘাত চলছেই। বাস্তব একটা অবলম্বনও পাওয়া গেছে সকলে মিলে গড়া পিস-কমিটিতে, বিভ্রান্ত না করে যার জন্মলাভের প্রক্রিয়াটাও জাগিয়েছে আস্থা। কারণ, বড়ো বড়ো কথা উথলায়নি সভায় আদর্শমূলক ভাবোচ্ছ্বাসে, মিলনকে আয়ত্ত করার চেষ্টা হয়নি শুধু মিলনের জয়গান গেয়ে, এই খাঁটি বাস্তব সত্যটার উপরেই বেশি জোর পড়েছে যে এ পাড়ায় হাঙ্গামা হলে সবার সমান বিপদ, এটা মেশাল পাড়া।

হয়তো এ পাড়ায় শুরু হবে না সে তাণ্ডব, কে জানে। চারিদিকে যে আগুন জ্বলেছে। তার হলকাতে ছ্যাঁকা লেগে লেগেই মনে কী কম জ্বালা। সবহারা শোকাতুর দিশেহারা আপনজনেরা এসে অভিশাপ দিচ্ছে, বলছে মারো, কাটো, জবাই করো, শেষ করে ফ্যালো। এ এসে ও এসে বুঝিয়ে যাচ্ছে মারা ছাড়া বাঁচার উপায় নেই।

অনেককালের মেশামেশি পাশাপাশি বসবাস। হয়তো তেমন ঘনিষ্ঠ নয় মেলামেশা সবার মধ্যে, সেটা আসলে কিন্তু এটা শহর বলেই। পাখা সবারই পঙ্গু, মানুষকে হাঁস-মুরগি করে রাখা মর্জি মালিকের। পাখা ঝাটিয়ে চলতে হয় জীবনের পথে।

তাই তো বলি পাখি নাকি আমরা, হালিমা বলে মুখোমুখি জানলায় দাঁড়িয়ে, তাড়া খেয়ে খেয়ে আজ এখানে কাল সেখানে উড়ে বেড়াব ? গাছের ডালে বাসা বানাব ?

আর বোলো না ভাই, ইন্দিরা বলে, মাথা ঘুরচে কদিন থেকে। এ সব কী কাণ্ড। আঁা ! কী রাঁধলে ?

তেমন প্রাণখোলা আলাপ কিন্তু নয়, কদিন আগের মতো। গলায় মৃদু অস্বস্তির সুর দুজনেরই, চোখ এড়িয়ে সন্তর্পণে জানালা দুটির একটি করে পাট খুলে কথা কইছে, কাজটা যেন অনুচিত ; আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে হঠাৎ। দুজনের বাড়িতেই আচমকা আশ্রয় নিতে আত্মীয়স্বজনের আবির্ভাব ঘটেছে বলেই নয় শুধু, বাড়ির মানুষ বারণ করে দিয়েছে মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা—অন্তত সাময়িক ভাবে।

কী যে হবে ভাবছি।

দুধে নাকি বিষ মেশাচ্ছে গয়লারা। দুধ জ্বাল দিয়ে আগে বেড়ালটাকে খানিকটা খাওয়াতে হয়, ছেলেপিলেরা খিদেয় কাঁদে, দেওয়া বারণ। আধঘণ্টা বেড়ালটা কেমন থাকে দেখে তবে ওরা পায়।

রুটি আনা বন্ধ করেছেন। রুটি যারা বানায় তাদের মধ্যে তোমরাই নাকি বেশি। এক টুকরো রুটি আর চা জুটত সকালে, এখন শুধু একটু গুড়ের চা খেয়ে থাকো সেই একটা দুটো পর্যন্ত।

এত লোক বেড়েছে, ডাল-তরকারি ছিটেফোঁটা একরোজ থাকে, আর একরোজ একদম সাফ। ভাতেও টান পড়ে।

আজ চিড়ে খেয়েছি নুন দিয়ে। গুড়ও নেই।

চোখে চোখে চেয়ে খানিক মাথা নিচু করে থাকে দুজন। ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় জানালার পাটদুটি।

ছেলেমেয়ের সংখ্যাও বেড়ে গেছে দু বাড়িতে। অন্য অঞ্চল থেকে উৎখাত হয়ে তারা বড়োদের সঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছে। মুখ চেনাচিনিও হয়নি বড়োদের মধ্যে কিন্তু ছেলেমেয়েদের কে ঠেকিয়ে রাখবে ? তাদের মেলামেশার দাবি রাজনীতির ধার ধারে না, আপস অনুমতির তোয়াক্কা রাখে না, জাতধর্মের বালাই মানে না। স্কুল নেই, লেখাপড়া নেই, বেড়ানো নেই, বাড়ির এলাকার বাইরে যাওয়া পর্যন্ত বারণ। বড়োদের মুখ অন্ধকার, বাড়িতে থমথমে ভাব, মুমূর্ষু রোগী থাকলে ঘনঘন ডাক্তার আসবার সময় যেমন হয়। ওরা তাই করে কী, হাবিব আর গীতার নেতৃত্বে নিজেরাই আয়োজন করে

কি ছেলেমানুষি করে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[illegible]

ছেলেমানুষি গল্পের পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

মিলেমিশে খেলাধুলো করার। বাড়িতে ঠাঁই নেই, নিজেরাই তৈরি করে নেয় খেলাঘর। হাঙ্গামা করতে হয় না বেশি, বাইরের প্যাসেজে দুপাশের দেয়ালে দুটো পেরেক পুতে একটা কাপড় টাঙিয়ে দিতেই প্যাসেজের শেষের অংশটুকু পরিণত হয়ে যায় চারিপাশ ঘেরা ছোটোখাটো একটি ঘরে। কিছু চাল ডাল ডাঁটাপাতা জোগাড় হয়েছে। গীতা এনে দিয়েছে ছোটো তোলা উনুনটি আর তেলমশলা ! তরকারির অনটনে সবার মন খুঁতখুঁত করতে থাকায় হাবিব এক ফাঁকে বাড়ির ভেতর থেকে সরিয়ে এনেছে কিছু আলু পেঁয়াজ আর একটা আস্ত বেগুন। জোরালো পরামর্শ চলছে, সব কিছু দিয়ে এক কড়া খিচুড়ি রাঁধা অথবা খিচুড়ি ভাজা তরকারি সবই রাঁধা হবে। রান্নার ভার নিয়েছে মেহের, তার বয়স ন-দশবছর, এই বয়সেই বড়োদের আসল রান্নার কাজে তাকে সাহায্য করতে হয় বলে তার অভিজ্ঞতার দাবি সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে।

কিন্তু উনুনে তাদের আঁচও পড়ে না, রান্নাও শুরু হতে পায় না। টের পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে দু বাড়ির বড়োরা। মেহেরের বাপের নিকা বউ নুরুন্নেসা মেয়ের বেণি ধরে মাথা টেনে গালে চড় বসায়। পুষ্পর মাসিমা এক ঠোনায় রক্ত বার করে দেয় ভাগনির ঠোঁটে। কান ছাড়াতে হাত পা ছোঁড়ে গীতা, লাথি লাগে তারাপদর পেটে। হাবিব কামড় বসিয়ে দেয় নাসিরুদ্দীনের হাতে। বাচ্চাদের কাঁদাকাটা বড়োদের হইচই মিলে সৃষ্টি হয় আওয়াজ। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে কী হয়েছে জানতে চেয়ে বাধিয়ে নেয় রীতিমতো হুল্লোড়, প্যাসেজের মুখে গলিতে জমে ওঠে লাঠি রড ইট হাতে ছোটোখাটো ভিড়।

কয়েক মুহূর্ত, আর কয়েক মুহূর্তে স্থির হয়ে যাবে মেশাল পাড়াব ভাগ্য—জিইয়ে বাখা শান্তি অথবা অকারণে ডেকে আনা সর্বনাশ। কান্না ভুলে বড়ো বড়ো চোখ মেলে ছেলেমেয়েরা চেয়ে দেখে বড়োদের অর্থহীন কাণ্ড।

ভলান্টিয়ার সঙ্গে নিয়ে পিস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক দুজন ছুটে আসায় অল্পের জন্য হাঙ্গামা ঠেকে যায়। সম্পাদক দুজন ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেন।

ভিড়ে ভাঙন ধরে। দু-চারমিনিটের মধ্যে ভলান্টিয়াররা ভিড় সাফ করে দেয়।

তখন যুগ্ম-সম্পাদক দুজন পরামর্শ করে ভলান্টিয়ারদের পাঠান পাড়ায় পাড়ায় সত্য ঘটনা প্রচার করতে। এমন স্পর্শকাতর হয়ে আছে মানুষের মন যে এ রকম তুচ্ছ ঘটনাও দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়তে পারে মারাত্মক গুজব হয়ে।

বিকালে একটা লরি আসে পুলিশ ও সৈন্যের ছোটো একটি দল নিয়ে। চারিদিক তখন শান্ত। বুটের আওয়াজ তুলে কিছুক্ষণ তারা এদিক ওদিক টহল দেয়। এ বাড়ি ও বাড়ির দরজায় ঘা মেরে এর ওর দোকানে ঢুকে জিজ্ঞাসা করে কোথায় গোলমাল হয়েছিল। জবাব শোনে আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য, যে কোথাও গোলমাল হয়নি। ক্রুদ্ধ অসন্তুষ্ট মনে হয় তাদের, আগমন কি তাদের অনর্থক হবে ? গলির মোড়ে নিতাইয়ের দোকানের একপাশে তক্তপোশ পেতে চারজন সশস্ত্র সৈন্যের ঘাঁটি বসিয়ে লরি ফিরে যায় বাকি সকলকে নিয়ে। নতুন এক সশঙ্ক অস্বস্তিবোধ ছড়িয়ে পড়ে মেশাল পাড়ায়। সাঁঝবাতির আগেই বন্ধ হয়ে যায় দোকানপাট, মানুষ গিয়ে ঢোকে কোটরে, শূন্য হয়ে যায় পথ।

এ বাড়ি থেকে কথা শোনা যায় ও বাড়ির। কিন্তু কথার আদানপ্রদান বন্ধ হয়ে গেছে। চুপিচুপি দু-এক মুহূর্তের জন্য মুখোমুখি জানালার পাটও একটু ফাঁক হয় না। এ বাড়ি ভাবে ও বাড়ির জন্য মিলিটারি এসে পাড়ায় গেড়ে বসেচে কী জানি কখন কী হয়। ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া বারণ। ঘরের জেলে তারা কয়েদ।

ছাত ভাগ করা দেয়ালের এ পাশ থেকে গীতা বলে, আসবি হাবিব ?

মারবে যে ?

না পিসির ঘরে চুপিচুপি খেলব।

পিসি বকবে তো ?

দুর। রান্না করে নেয়ে আসতে পিসির বিকেল বেজে যাবে।

ছাতের সিঁড়ির মাঝে বাঁকের নিচু লম্বাটে কোটরটি পিসি বহুদিন দখল করে আছে, তার নীচে দোতলার কলঘর। লম্বা মানুষ এ ঘরে দাঁড়ালে ছাতে মাথা ঠেকবে। পিসির নিজস্ব হাঁড়িকুঁড়ি কাঠের বাক্সো কাঁথা বিছানায় কোটরটি ভরা। কুশের আসন পেতে এ ঘরে পিসি আহ্নিক করে। আমিষ-রান্নাঘরে একবার ঢুকলে স্নান করে শুদ্ধ হবার আগে পিসি আর এ ঘরে আসে না।

ঘরের মধ্যে এ ভাবে লুকিয়ে চুপিচুপি কী খেলা করবে, হাবিবকে নিয়ে এ বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যোগ দেবার উপায় নেই, ওদেরও ডাকা যায় না এখানে। তাই নতুন খেলা আবিষ্কার করে নিতে হয়।

দাঙ্গা দাঙ্গা খেলবি ? গীতা বলে।

লাঠি কই ? ছোরা কই ? প্রশ্ন করে হাবিব।

গীতা বলে, দাঁড়া।

গীতা চুপিচুপি অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। তারাপদর খুর আর ছুরি। খুরটি পুরানো, কামানো হয় না, কাগজ পেন্সিল দড়ি কাটার কাজেই লাগে। পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক কষ্টে গীতা ভেতর থেকে দরজার ছিটকিনি এটে দেয়। হাবিবের চেয়ে সে একটু ঢ্যাঙা।

তুই আকবর আমি পদ্মিনী। আয় !

খেলা, ছেলেখেলা। অসাবধানে কখন যে সামান্য কেটে যায় একজনের গা অপরের অস্ত্রে।

মারলি ?

ব্যথা পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে সে প্রতিশোধ নেয় অপরের গায়ে। জেদি দুরন্ত ছেলেমেয়ে দুজন, ব্যথায় রাগে অভিমানে দিশেহারা হয়ে কাটাকাটি হানাহানি শুরু করে ভোতা খুর আর ভোতা ছুরি দিয়ে। সেই সঙ্গে চলে গলা ফাটিয়ে আর্তকান্না। ইন্দিরা পিসিমারা ছুটে আসে কলরব করে। ছুটে আসে ও বাড়ির হালিমা নুরুন্নেসারা। তারা সিঁড়িতে উঠে পিসির কোটরের দরজার সামনে ভিড় করে থাকায় তারাপদ ও বাড়ির অন্য পুরুষদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয় সিঁড়ির নীচে।

সদর দরজায় বাড়ির অন্য পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে নাসিরুদ্দীন হাঁকে, তারাপদ !

দুটি মাত্র শিক বসানো ছোট্ট একটি খোপ আছে পিসির ঘরে, এক সময় একজনের বেশি দেখতে পারে না ভেতরের কাণ্ড। এক নজর ভেতরে তাকিয়ে ইন্দিরা আর্তনাদ করে উঠে, মেরে ফেলল ! মেয়েটাকে মেরে ফেলল গো।

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায় : খোল ! খোল ! দরজা খোল ! খুনে ছোঁড়া দরজা বন্ধ করে খুন করছে মেয়েটাকে। দরজা খোল !

হালিমাও এক নজর তাকিয়ে অবিকল তেমনি সুরে আর্তনাদ করে ওঠে, মেরে ফেলল ! ছেলেটাকে মেরে ফেলল !

দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে চেঁচায়। খোল ! খোল ! দরজা খোল ! খুনে ছুঁড়ি দরজা বন্ধ করে খুন করছে ছেলেটাকে। দরজা খোল।

পিসি চেঁচায়, হায় হায় হায়, সব ছোঁয়াছুঁয়ি করে দিলে গো !

নীচে থেকে নাসিরুদ্দীন হাঁকে, তারাপদ ! আমরা অন্দরে ঢুকব বলে দিচ্ছি !

পিসিকে ঠেলে সরিয়ে ইন্দিরা আর হালিমা একসঙ্গে পাগলিনির মতো খোপের ফোকর দিয়ে ভেতরে তাকাতে চায়, মাথায় মাথায় ঠেকাঠেকি হয়ে যায় দুজনের। আক্রমণে উদ্যত বাঘিনির মতো হিংস্র চোখে তারা পরস্পরের দিকে তাকায়।

ভেতরে ততক্ষণে গীতা আর হাবিবের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়েছে। বাইরের হট্টগোলে চুপ হয়ে গেছে তারা। কিন্তু লড়াই থামায়নি, আগে কে হার মানবে অপরের কাছে ! নিঃশব্দে মেঝেতে পড়ে জড়াজড়ি কামড়াকামড়ি করে। ভেঙে চুরমার হয়ে যায় পিসির হাঁড়িকুঁড়ি।

হায়, হায় ! সব গেল গো, সব গেল !

নাসিরুদ্দীনকে ওপরে ডেকে আনে তারাপদ।

সেই লাথি মেরে দরজা ভাঙে। দরজাটা ঠিক ভাঙে না, ছিটকিনিটা খসে যায়।

ওপর ওপর চামড়া কাটাকুটি হয়েছে খানিকটা, কিছু রক্তপাত ঘটেছে। নিজের নিজের সন্তানকে বুকে নিয়ে কিছুক্ষণ ইন্দিরা আর হালিমা ব্যাকুল দৃষ্টি বুলিয়ে যায় তাদের সর্বাঙ্গে। তারপর প্রায় একই সময় দুজনে মুখ তোলে চোখে অকথ্য হিংসার আগুন নিয়ে। দুজনেই যেন অবাক হয়ে যায় অপর কোলে আহত নির্জীব অপরের সন্তানটিকে দেখে, বহুকাল ভুলে থাকার পর দুজনেই যেন হঠাৎ আবিষ্কার করেছে অন্যজনও মা, তার সন্তানের গায়েও রক্ত।

বাইরে আবার ভিড় জমেছিল। আবার অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সংঘর্ষ। তারাপদ আর নাসিরুদ্দীন দু বাড়ির এই দুই কর্তাকে পাশাপাশি সামনে হাজির করতে না পারলে পিস কমিটি এবার কোনোমতেই ঠেকাতে পারত না সর্বনাশ।

আইডিন লাগিয়ে নাইয়ে খাইয়ে দু বাড়িতে শুইয়ে রাখা হয হাবিব আর গীতাকে। ছুটিব দিন, ঢিমেতালে সংসারের হাঙ্গামা চুকতে চুকতে এমনিই দুপুর গড়িয়ে যেত আগে, এখন আবার বাড়তি লোকের ভিড়। বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ আগে পরে দু বাড়িতে খোঁজ পড়ে ছেলেমেয়ে দুটির।

খোঁজ মেলে না একজনেরও।

আবার তন্নতন্ন করে খোঁজা হয় বাড়ি, আনাচ-কানাচ, চৌকির তলা। গীতা বাড়িতে নেই। হাবিব বাড়িতে নেই।

শঙ্কায় কালো হয়ে যায় দু বাড়ির মুখ। কিছুক্ষণ গমগম করে স্তব্ধতা, তারপর ফেটে পড়ে মুখর গুঞ্জন।

এ বাড়ি বলে বুক চাপড়ে : শোধ নিয়েছে। ভুলিয়ে ভালিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে হয গুম করে রেখেছে, নয়—

ও বাড়ি প্রতিধ্বনি তোলে মাথা কপাল কুটে।

তারাপদ বলে, গীতা নিশ্চয় আছে তোমার বাড়িতে নাসির।

নাসিরুদ্দীন বলে, হাবিবকে তোমরা নিশ্চয় গুম করেছ তারাপদ।

এবার আর রোখা যায় না, আগুনের মতো গুজব আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এত চেষ্টা করেও উসকানিদাতারা এ মেশাল পাড়ার শান্তিতে দাঁত ফোটাতে পারেনি, এমনই একটি সুযোগের জন্য তারা যেন ওত পেতে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে বাড়ি দুটির সামনে জড়ো হয় দু দল উন্মাদ মানুষ। এরা এ বাড়িতে চড়াও হবে, ওরা ও বাড়িতে। কিন্তু দল যখন দুটি তখন আগে বাইরে রাস্তায় লড়াই করে অন্য দলকে হটিয়ে জয়ী হতে না পারলে কোনো দলের পক্ষেই বাড়ি চড়াও হওয়া সম্ভব নয়।

মারামারি হবেই। সেটা জানা কথা। আগেই বেধে যেত, পিস কমিটির চেষ্টায় শুধু দু-দশ মিনিটের জন্য ঠেকে আছে।

যুগ্ম-সম্পাদক বলেন, আমরা তল্লাশ করাচ্ছি বাড়ি।

জনতা সে কথা কানে তোলে না। তাদের শান্ত রাখতে গিয়ে গালাগালি শোনে, মারও খায় কয়েকজন ভলান্টিয়ার। তবু তারা চেষ্টা করে যায়। গলির মোড়ের সৈন্য চারজন চুপচাপ বসে আছে।

এমন সময় কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে, ওই যে হাবিব ! ওই যে।

আরেকজন চেঁচায়, ওই তো গীতা !

সকলের দৃষ্টিই ছিল নীচের দিকে, এ অবস্থায় কে চোখ তুলে তাকাবে ওপরে। কারও নজরে পড়েনি যে, নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়ির চিলেকুঠির ছাত থেকে কিছুক্ষণ ধরে পাশাপাশি একটি ছেলে ও মেয়ে মুখ বাড়িয়ে নীচের কাণ্ডকারখানা লক্ষ করছে। ছাত ভাগ করা দেয়ালের দু পাশে দু বাড়ির ছাতের সিঁড়ির চিলেকুঠি একটাই। কখন যে তারা দুজন চুপিচুপি সকলের চোখ এড়িয়ে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে খেলতে উঠেছিল ! মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে কয়েকজন কলরব করে ওঠে : পাওয়া গেছে ! দুজনকেই পাওয়া গেছে !

সবার চোখের সামনে হারানো ছেলেমেয়ে দুটোর অকাট্য জলজ্যান্ত আবির্ভাব হল বলেই যে মারামারি ঠেকানো যেত তা নয়। হিংসায় উত্তেজনায় জ্ঞান হারিয়ে যারা খুনোখুনি করতে এসেছে অনেকে তারা জানেও না ওদের দুটিকে নিয়েই আজকের যত গন্ডগোলের সূত্রপাত। হঠাৎ এই খাপছাড়া ঘটনায়, দু দলেই কিছু লোক চঞ্চল হয়ে সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠায়, ব্যাপারটি কী জানবার জন্য যে কৌতূহল জাগল জনতার মধ্যে, সঙ্গে সঙ্গে পিস কমিটির সম্পাদক দুজন সেটা কাজে লাগিয়ে ফেলায় ঘটনার মোড় ঘুরে গেল।

জনতা সাফ হয়ে যাবার অনেক পরে আবার লরি বোঝাই মিলিটারি এল।

বহুক্ষণ সার্চ চলে নাসিরুদ্দীন আর তারাপদর বাড়িতে, গুম করা ছেলেমেয়ে দুটির সন্ধানে। হালিমা আর ইন্দিরার পা ঠেসে দাঁড়িয়ে ভীত চোখে তাই দেখতে থাকে গীতা আর হাবিব।

স্থানে ও স্তানে

চেনা লোক বলে, পালাচ্ছেন তো !

বুক যার ছোটো হয়ে গেছে ভয়ে, উপায় থাকলে আজকেই সপরিবারে পালাত নিজেই, তার প্রশ্নটা ঝাঁঝালো, মন্তব্য যা যোগ হয় প্রশ্নের সঙ্গে তার ঝাঁঝ আরও বেশি।

পালাব কেন ? নরহরি বলে, স্ত্রীকে আনতে যাচ্ছি।

দু-একজন তাকে যারা ভালো করে চেনে, বিশ্বাস করে।—সেকী, এখন আনবেন ? পনেরোই আগস্ট যাক ? দু-একমাস দেখুন কী দাঁড়ায়। নিজে থাকেন আলাদা কথা, এ সময় মেয়েছেলেদের আনাটা—

পেটের দায়ে থাকতেই যখন হবে, দেরি করে লাভ কী। কিছু হবে না ধরে নেওয়াই ভালো তাতে মনের জোর বাড়ে।—নরহরি জবাব দেয়।

স্টিমারে অসম্ভব ভিড়। পলাতক আছে, সবাই নয়। ভিড় এ স্টিমারে বরাবর হয়, জীবনযাত্রার প্রয়োজনে, ছড়ানো জীবনের সঙ্গে যোগসূত্রের কল্যাণে, এমনি গোরুছাগলের মতোই মানুষ বরাবর যাতায়াত করে আসছে। তার মধ্যেও যেন কেমন শান্তি শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল। নদীর বিস্তৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো একটা উদারতা। আজ সকলের চোখেমুখে নড়াচড়ায় কথা বলার ভঙ্গিতে সমবেত গুঞ্জনে একটা চাপা উত্তেজনা, প্রত্যাশা ও ভয়, দম্ভ ও পরাজয়, উদ্‌বেগের চঞ্চলতা। অথচ অসংখ্য ব্যবহারে মুহূর্তে মুহূর্তে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সীমাসংখ্যাহীন অচেতন আদান প্রদানে, সবাই ঠিক আগের মতোই মানুষ। মনে হয়, বাইরে থেকে আরোপ করা কৃত্রিম এক চেতনায় যেন আবর্ত আর সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

ট্রেনে এক দুর্ঘটনা ঘটল। মাঝরাতে একটা অসম্পূর্ণ ডাকাতি হয়ে গেল মেয়েদের কামরায়। দশ-বারোজন ডাকাত সকলেই অস্ত্রধারী, দুজনের অস্ত্র আগ্নেয়। গাড়িতে সেপাই পুলিশ ছিল কিনা টের পাওয়া গেল না ডাকাতেরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে। আগের স্টেশন থেকে ছাড়ার পর গাড়ির গতি যখন একবার মন্থর হয়ে আসে লোকগুলি তখন কামরায় ওঠে। ঠিক ওখানে দুটি স্টেশনের মাঝামাঝি ওই নির্জন জায়গায়, গাড়ির গতি এ রকম কমে যাওয়ার কৈফিয়ত পরে দিতে হবে, এটুকু ভাবনাও নেই গাড়ি যারা চালায় তাদের। গয়নাগাটি সব সংগ্রহ করে একটি তরুণীকে সাথি করে নির্দিষ্ট স্থানে চেন টেনে নেমে পালাবার ব্যবস্থাই বোধ হয় তাদের ছিল। কিন্তু উঁচানো ছোরা বন্দুক গ্রাহ্য না করে মেয়েটির মা আগেই চেন টেনে বসায় তাকে আহত করে অসমাপ্ত রেখেই লোকগুলি নেমে পালায় ! একদল যাত্রী হইহই করে নেমে এসে তাড়া করে। বন্দুকের গুলি তাদের ঠেকাতে পারেনি, ঠেকিয়েছিল অজানা মাঠ জঙ্গল অন্ধকার।

এটা জানা ছিল না নরহরির, সে শুনেছিল অন্যকথা। এ সব নিত্যকার ঘটনা আর এ রকম হামলা হলে নাকি যাত্রীরা সাড়া দেয় না, মটকা মেরে পড়ে থাকে বা বসে ঝিমোয়। শেষটা তা হলে সত্যি নয় !

শিয়ালদার গাড়ি পৌঁছল দেরিতে, এটাও নিত্যকার ব্যাপার। বিছানা বগলে ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে নরহরি একবার তাকিয়ে দেখল এই অতি পরিচিত শহরের স্টেশনের বাইরের অংশটুকুকে। সম্প্রতি যে বিজাতীয় আক্রোশ তার জন্মেছে এই শহরটির প্রতি তাই যেন উথলে উঠে নিরস্ত করেছে তার পদক্ষেপ। ছাত্রজীবনের আনন্দ উত্তেজনা স্বপ্নের সমারোহে বিয়েবাড়ির আলো আর সানাইয়ের তানে,

সুমিত্রাকে বাপের বাড়ি আনা নেওয়ার বিরহ-মিলনের মাধুর্যে কী প্রিয় ছিল এ শহর তার কাছে। কদিন আগেও ছিল। প্রিয় আর রোমাঞ্চকর তারই জমজমাট গৌরব। ঢাকায় বসে সে কাগজে খবর পড়েছে আর খুশি হয়ে অনুভব করেছে তার নিজের চঞ্চল রক্তের তাপ। ছাত্র অভিযানের জয়, লাখ নাগরিকের মিলন-অভিযানের জয়, ধর্মঘটের জয়, মিলিটারি অত্যাচার, পুড়িয়ে মারার জয়, জয়ের পর জয়। তারপর যে একটানা দীর্ঘ বীভৎসতায় মেতেছে কলকাতার লোক, তাও নবহরির কাছে শহরটিকে অপ্রিয় ঘৃণ্য কবে তুলতে পারেনি। ক্ষোভে দুঃখে অভিমানে সে শুধু মুষড়ে গিয়েছে, কাতর হয়েছে।

আজ সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে কলকাতাকে। এতদিন তার ধারণা ছিল যে অন্ততপক্ষে নিজের নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে মারামারি করে এ শহরের হিন্দু-মুসলমানবা। তার সে ভুল ভেঙে গেছে। এ শহরে হিন্দুও থাকে না, মুসলমানও থাকে না। এটা বজ্জাতদের আস্তানা !

সুমিত্রার বাপের বাড়ি পর্যন্ত হয়তো পৌঁছবে না, পথেই ঘায়েল হয়ে যাবে। সে আতঙ্ক আছে। কিন্তু যদি মরে, মরবে সে বিষাক্ত সাপের ছোবলে। কলকাতা সাপভোজী সাপের আস্তানা। হিন্দু সাপ মুসলমান সাপ বলে তো কিছু থাকতে পারে না, নিছক সাপ।

অতুলবাবুই অভ্যর্থনা করল জামাইকে, এসো বাবা এসো। ভয়ে ভাবনায় ছিলাম তারটা পেয়ে থেকে। বেয়ান ভালো আছেন ? কবরেজের ওষুধ খেয়ে কমেছে একটু ?

মা পুরী গেছেন ও মাসে।

ওঃ ! তা ভালো আছেন তো ? পুরীও নিরাপদ নয় মোটে। কাগজে যা পড়ছি বাবাজি, মাথা ঘুরে যায়। উড়িস্যার ছোঁড়াগুলি নাকি দল বেঁধে বাঙালি মেয়েদের ওপর অত্যাচার করছে।

মার বয়েস তো প্রায় সত্তর হল।

বড়ো শালা পরিমল বলল, ওনার ভয় নেই। কিন্তু যুবতি বাঙালি মেয়ে তো অনেক আছে উড়িষ্যায়। এদিকে গুন্ডারা খাবলা দিচ্ছে বাঙালি মেয়ের ওপর, ওদিকে উড়িয়ারা অত্যাচার শুবু করেছে, কী বিপদ ভাব তো !

মেজো শালা শ্যামল বলল, দুটো উড়িয়াকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়েছি আজ জন্মে ভুলবে না। মুড়িমুড়কির দোকানেব ওই অর্জুন আব সতীশবাবুর চাকরটাকে। সুধীনবাবুব ঝি আব অর্জুনের বউটাকে ছেলেরা ধরেছিল। তা আমরা ভেবে দেখলাম কী, যতই হোক আমরা শিক্ষিত ভদ্রলোক, মেয়েছেলের গায়ে হাত দেওয়া উচিত হবে না। ভেবেচিন্তে তাই ছেড়ে দিলাম। জানো নরহরি, ভদ্র হয়েই আমরা আজ বিপদে পড়েছি। ওদের মেয়েছেলের ওপব যদি অত্যাচার চালাতে পারতাম, ওরা ঠান্ডা হয়ে যেত।

নরহরির খিদে পেয়েছিল। বমিও পেতে থাকে।

আদর অভ্যর্থনা হয় নিখুঁত। বড়োলোক নয় নরহরির শ্বশুর, অথচ ভেজিটেবিল ঘিয়ে ভাজা লুচির সঙ্গে সন্দেশ দেওয়া হয় তাকে জলখাবার। ঘরে তৈবি মিষ্টি ছানা নয়, দোকানের দামি সন্দেশ। খাবারের দোকান সব বন্ধ, তবু।

কার ছেলে কাঁদছে গলা ফাটিয়ে, তার বাচ্চাটার আওয়াজের মতোই যেন মনে হয়। শালি সুষমা তাকে শান্ত করছে, চুপ, চুপ, শিগগির চুপ,—মুসলমান ধরে নেবে !

পালটা ছড়াও শুনেছে নরহরি—চুপ, চুপ, শিখ আসছে !

তা, দুমুখী ক্রিয়ার দুমুখী প্রতিক্রিয়া হবেই।

অতুল সাবধান করে দেয়, কাজ না থাকলে বেরিয়ে কাজ নেই।

শ্যামল ব্যাখ্যা করে বলে, বেরোনো মানেই প্রাণ হাতে করে যাওয়া। এখানে হাঙ্গামা নেই, যেখানে যাবে সেখানেও নেই, কিন্তু যেতে হয়তো হবে এমন এলাকা দিয়ে—

মুশকিল ওইখানে, পরিমল বলে সায় দিয়ে, কোনো এলাকাটা সেফ নয়, জানাটানা থাকলেও বরং খানিকটা—

নরহরির মুখ দেখে ছোটো শালা অমল বলে, আচ্ছা, অত বলতে হবে না, জামাইবাবুর প্রাণের মায়া আছে। দরকার থাকলে বেরোবেন, যেদিক সেদিক ঘুরবেন না, ব্যাস্।

তুই তো বলেই খালাস—পরিমল চটে বলে, জামাইবাবু জানবে কী করে ? ব্যাটারা ট্রাম চালু রেখেছে চাদ্দিকে। নরহরির মনে হতে পারে না ট্রাম যখন চলছে এদিকে ভয় নেই ? ব্যাটাদের এরিয়ায় ভুল করে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নামিয়ে—

ভুল করে তোমাদের এরিয়ায় ঢুকলে তোমরা সন্দেশ খাইয়ে দাও না ?

গম্ভীর হয়ে যায় বাপদাদাদের মুখ। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের মতো ছোঁড়ার বিশ্রী গা-জ্বালানো কথাবার্তা।

নরহরি সবিনয়ে বলে, বেরোব আর কোথায়, দু-একটা জিনিসপত্র কেনা। কারও সাথে দেখা করার সময় হবে না। গোছগাছ করে দিনে দিনেই স্টেশনে চলে যাব সবাইকে নিয়ে।

সত্যি সুমিকে নিয়ে যাবে বলছ নাকি ? পরিমল বলে।

চিঠি পাননি?

চিঠি তো পেয়েছি। মানে বাপু বুঝতে পারিনি চিঠিব তোমার। মাথা খারাপ না হলে কেউ—

থাক, থাক। অতুল বলে হবেখন ও সব কথা। নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, ওবেলা বসে পরামর্শ করা যাবে। আজ তোমাদের যাওয়া হয় না।

নেয়ে খেয়ে জিরিয়ে নাও, আমার মেয়ের সঙ্গে আগে বোঝাপড়া কর, মাথা তোমাব ঠান্ডা হোক, ওবেলা আমরা তোমায় ছেঁকে ধরব ! এ রাজনীতি নরহরি জানে।

আরও ঠান্ডা হয়ে, আরও সবিনয়ে নরহরি বলে, আজকেই রওনা দিতে হবে। চিঠি লেখাব সময় ভেবেছিলাম দু-একদিন থাকতে পারব। সে উপায নেই। বোঝেন তো অবস্থা।

স্টেশনেও ঠিক করেনি আজকেই ফিরে যাবে। কাল থেকে পরশু রওনা দেবে ভাবা ছিল। রাজপথে শহরের সন্ত্রস্ত চেহারা, বাস থেকে ক্ষণকালের দেখা পাশের গলি থেকে বেরিয়ে আসা কতগুলি লোকের নির্ভয়ে নির্বিকার চিত্তে একজন পথচারীকে, একক পথচারীকে কুৎসিত মৃত্যুদানেব ঘটনা, এ বাড়ির হিংস্র বদ্ধ আবহাওয়া, তার দম আটকে আনছে। পরম শুভাকাঙ্ক্ষী এই সব আত্মীয়কে মনে হচ্ছে শত্রু।

ব্যাপারটা কী বল তো ? আলোচনা পিছিয়ে দেবার আশা ছেড়ে অতুল বলে, যে পারে পালিয়ে আসছে, যে না পারে সে অন্তত মেয়েছেলেকে সরিয়ে দিচ্ছে, আর তুমি বলছ সুমিকে নিয়ে যাবে !

যে পারে সেই পালিয়ে আসছে না। এমন ঢের লোক আছে যারা অনায়াসে চলে আসতে পারে, তারা ওখানে থাকা ঠিক করেছে।

সে আর কদ্দিন থাকবে ! শ্যামল হেসে বলে, তোমার তাড়াহুড়োটা পড়ল কীসে ? টিকতে যদি ওরা দেয়, তখন নয় নিয়ে যেও সুমিকে, এখন কেন ?

কাজ বজায় রাখার জন্য নিতে হচ্ছে। ওলট-পালট হচ্ছে তো চারিদিকে, কতক লোক থাকবে, কতক নতুন লোক আসবে, কিছু লোকের কাজ যাবে ! এদের না নিয়ে গেলে কাজটা যেতে পাবে আমার।

সে কী !

তাই তো স্বাভাবিক। ঘরসংসার পেতে যারা আছে, যারা থাকতে চায়, তারা নিশ্চয় প্রেফারেন্স পাবে। আমি বউ ছেলে পাঠিয়ে দেব কলকাতায়, পালাবার জন্য এক পা বাড়িয়ে থাকব, আমায় খাতির করবে কেন ?

বলেছে নাকি ? তোমার তো হিন্দু আপিস ! হিন্দু হয়ে কর্তা তোমায় এ কথা বলল ?

নরহরি শ্রান্ত চোখে তাকায়।—কর্তাকে তো থাকতে হবে ওখানে, ও দেশের লোক হয়ে ? যখন খুশি ফেলে পালিয়ে আসার জন্য তৈরি থাকব, তবু কর্তা আমায় পায়ে তেল দিয়ে রাখবে ? যে পরিবার নিয়ে থাকবে বলে আছে তাকে ছাড়াবে আমায় রেখে ?

যায় যাবে অমন কাজ ! শ্যামল বলে বীরের মতো, চাকরিব জন্য বউটাকে অমন বিপদের মধ্যে নেওয়া যায় না। অল্পবয়সি মেয়ে বউ একটিকে ওরা ছাড়বে না।

কয়েক লাখ অল্পবয়সি মেয়ে বউকে ওখানে থাকতেই হবে শ্যামল। তোমার বোন যদি যান, আর একটি মোটে বাড়বে।

ও সব কথা রাখো, বিচক্ষণ অতুল বলে, ভয় তো আছে। কাজ যদি যায় অগত্যা যাবে, উপায় কী ! কলকাতায় চলে আসবে, একটা কিছু খুঁজে পেতে নেবে।

ঘরবাড়ি ফেলে চলে আসব ? আপনাদের তো হাজার হাজার লোকের চাকরি যাচ্ছে, চাকরি দেবে কে আমায় ?

সে যা হয় হবে, উপায় কী ! তাই বলে---

আপনি তো বলে খালাস !

সুমির মতো অনেককেই যে থাকতে হবে পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে, এ কথাটা গায়েও মাখল না কেউ, তুচ্ছ হয়ে উড়ে গেল। বোধ হয় ধারণায় আসে না। অন্য সকলের যা হয় হোক, এর মেয়ে আর ওদেব বোন সুমিত্রা নিরাপদ থাকলেই হল। সুমিত্রা তাব বউ বটে, শত শত বউয়ের কী হবে না হবে এ কথাটা সে কেন টেনে আনছে তার নিজের বউয়ের প্রসঙ্গে, বুঝে উঠতে পারছে না এরা। একটু স্তম্ভিত হযে গেছে তাব কথাবার্তায় !

তোমার মতলব ভালো নয় নরহবি, শ্যামল সক্রোধে বলে, স্ত্রীকে ঘুষ দিয়ে তুমি চাকবি রাখতে চাও !

অতুল অতিকষ্টে বিবাদ সামলায স্ত্রীর সাহায্য পেযে, সৌভাগ্যক্রমে চড়া গলার আওয়াজ পেয়েই নরহবির শাশুড়ি হলুদ-লংকা মাখা হাতেই ছুটে এসেছিল। মেয়েরা উঁকিঝুঁকি মারছিল দরজার আশেপাশে, আলোচনার গুরুত্ব বুঝে সাহস করে ঘরে ঢোকেনি, এবার ঘরে ঢুকেও তফাতে দাঁড়িয়ে এবং বসে রইল। সুমিত্রা ঝনাৎ ঝনাৎ চাবির রিঙের আওয়াজ করল তিন-চারবার পিঠে আছড়ে আছড়ে।

তবু, গুম খেয়ে যাবার আগে নরহবি ঘোষণা করল, হাজার হাজার স্ত্রীর যদি বিপদ থাকে, আমার স্ত্রীরও থাকবে।

চুপ করে থাকা উচিত জেনে পরিমলও তবু বলে, পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে ডুমড্ এ তো জানা কথাই !

গুম খেয়ে যাবে ঠিক কবেও নরহরি বলে, আমরা যদি ডুমড্ হই, আপনাদের জন্য হব। আপনারাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

অমল আগাগোড়া চুপ করে ছিল। সে মুখ খুললেই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদেব কথার চেয়ে তাব কথার বেশি জ্বালা ধরে বাড়ির লোকের গায়ে।

পার্কসার্কাসেব আমার একটি চেনা লোক বলছিল, এবার সে ধীরে ধীরে বলে এবং এমনই আশ্চর্য যে তার কথা শেষ পর্যন্ত শুনলে গায়ে জ্বালা ধরবে জেনেও সবাই যেন ধৈর্য ধরে মন দিয়ে তার কথা শোনে,—অ্যাদ্দিন হিন্দুদের শত্রু ভাবতাম, এবার দেখছি আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতভাইরাই আমাদের দফা সারবে !

তুই চুপ কর। কথা শোনার পর অতুল তাকে ধমকায়।

সুমিত্রা সুমিষ্টই আছে। অনেকদিন দেখা না হওয়ার সে মিষ্টতা ঘন হয়ে প্রায় দানা বেঁধেছে। আজ রবিবার, আপিসের তাড়া নেই, রাঁধাবাড়া খাওয়াদাওয়া টিমে তালে চলেছে। আজকের গাড়িতেই সুমিত্রাকে নিয়ে নরহরি রওনা দিলে অবশ্য একটা তাড়াহুড়োব প্রয়োজন ছিল, কিন্তু বাড়ির লোক জানে শেষ পর্যন্ত নরহরিকে পাগলামি ছাড়তেই হবে, সুমিত্রাকে সে রেখেই যাবে এখানে এবং দু-একটা দিন সে নিজে এখানে থাকবে। তবু, সংশয় আছে সবার মনে। মুখে যাই বলুক, মনে মনে সবাই জানে সমস্যা সহজ নয়, মোটেই তারা আয়ত্ত করতে পারেনি সমস্যার আগামাথা। নরহবি যেমন হোক একটা সিদ্ধান্ত করেছে। হৃদয়াবেগ যথাসম্ভব বাদ দিয়ে নিজের ভালোমন্দ হিসাব কবেই সিদ্ধান্ত করেছে। সহজ হবে না ওকে টলানো।

চিরদিন একটু জেদি আর একগুঁয়েও বটে সে—বাঙাল তো। সেবার ওর বড়োখোকার চিকিৎসা করছিল এ পরিবারের বিশ্বস্ত কবিরাজ, ও সবার মত উড়িয়ে দিয়ে সোজা গিয়ে ডেকে এনেছিল চারটাকা ভিজিটের অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার—শ্বশুরবাড়িতে পা দেবার দু ঘণ্টার মধ্যে।

বলেছিল, আমার ছেলে যদি মরে, আমি যে চিকিৎসায় বিশ্বাস করি সেই চিকিৎসায় মবুক।

কী কাটা কাটা কথা। ছেলেটা অবশ্য বেঁচে গেছে ভগবানের দয়ায়, কিন্তু ভগবান না কবুন কিছু যদি ভালোমন্দ হত ছেলেটার, আজ কোথায় মুখ থাকত নরহরির ? কী আপশোশটাই তাকে কবতে হত গুরুজনের কথা না শোনার জন্য, গুরুজনকে অবজ্ঞা করা জন্য !

তাই, তাড়া না থাকলেও বারোটার মধ্যে খাইযে দেওয়া হল নরহরিকে। ঘর ও বিছানা দেওযা হল শুতে। একটার মধ্যে সুমিত্রা ঘরে গেল। তার ছেলেটা ও বাচ্চা মেয়েটা জিম্মা রইল দিদি ও বউদিদিদের হেফাজতে।

ঘণ্টাখানেক জীবনমরণ সমস্যার কথা ওঠাই উচিত ছিল তাদের মধ্যে, কিন্তু সুমিত্রা ভাবল কী, বিরহে একেবারে চরমে চড়ে আছে মানুষটা, খাঁ খাঁ করছে, গুরুতর ব্যাপারটার মীমাংসাব এ সুবিধাটুকু না ছাড়াই ভালো। আগে বোঝাপড়া হোক, নরহরি স্বীকার করুক এখনকার মতো বাপের বাড়িতেই সে তাকে রাখবে, তারপর হাসিমুখে নিজেকে সে সঁপে দেবে। ব্যাকুল হয়ে পাগল হয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বে বুকে। ব্যাকুল সেও কি হয়নি ? কিন্তু মাথাগরম পুরুষমানুষের পাগলামি সামলে চলতে একটু সংযত না হলে চলবে কেন মেয়েমানুষের !

এসেই ঝগড়া শুরু করলে ? বেশ তুমি। পান চিবানো বন্ধ রেখে পানবাঙা ঠোঁটে হাসে সুমিত্রা, একটু বাঁকা হযে দাঁড়িয়ে আধভেজা চুল শুকনো তোয়ালেয় ঝাড়বার আয়োজন করে।

আমি ঝগড়া করলাম ? আশ্চর্য হয়ে বলে নরহরি, চিঠি লিখে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে তোমায নিতে এলাম, এখন বলছেন যেতে দেবেন না। তোমায় আমি যেখানে খুশি নিয়ে যাই, তাতে ওদেব কী ?

মনে মনে একটু চটে যায় বইকী সুমিত্রা।

ওরা আমার বাপ মা ভাই বোন যে গো। ভাবনা হবে না ?

হুঁ। আমি তোমার কেউ নই।

বাঃ বাঃ, কী যে বলে। তোমার হাতে সঁপে দিলেন আমায়, তুমি বুঝি রাস্তার লোক ? বাপভাই বুঝি রাস্তার লোককে ঘরে ডেকে শুতে দেয় ? আমি বুঝি রাস্তার লোকের—

জমে না, সুবিধা হয় না। অনেক হিংসা অনেক বিবাদ অনেক ভয়ংকর মৃত্যুর বাস্তবতা সব যেন ওলট-পালট করে দিয়েছে, খিল দেওয়া ঘরের নির্জন নিরিবিলি মাধুর্যের ভূমিকা পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়েছে কোটি জীবনের গুরুভার সমস্যার।

আমি তো আজকেই যাব ভাবছিলাম।

আমাকে নিয়ে ?

তবে কী ? তোমাকে নিতেই তো এলাম।

ক্রমে কলহ এবং কান্না। এ সব আগে হয়েছে অনেক, আজ যেন কী বিষে বিষাক্ত করেছে কলহ কান্নাকে। এ অস্ত্রও তেমন ফলপ্রদ নয় দেখে আবার মিষ্টি হয়ে উঠে নরহরির বুকে আশ্রয় করল সুমিত্রা। তাদের স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা কত নিবিড় কত ঘাতসহ হয়েছে সন্তানেব পিতামাতাব ভালোবাসা হয়ে। তবু যেন ফাটল ধরল, ভেঙে যাবার উপক্রম করল আজকের আঘাতে।

তুমি যদি বল, নরহরি যেন দেশরক্ষার প্রতিজ্ঞা নেবার মতো কবে বলল, আজ না গিয়ে পরশু যেতে রাজি আছি। কিন্তু তোমায় যেতে হবে।

আমি মরতে যেতে পারব না।

আমি যে মরব ?

সুমিত্রা চুপ করে থাকে।

এ ছেলেখেলা নয়, নরহরি বলে, রাগ-অভিমানেব কথা নয়। যদি না যাও আমাব সঙ্গে এখন, বাকি জীবনটা বাপের বাড়িতে কাটাতে হবে তোমার—বিধবাব মতো।

আমায় নয় মেরে ফেলে তুমি—আর্তনাদ করে ওঠে সুমিত্রা, রাতবিরেতে কে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে আমাকে, যা খুশি করবে আমায় নিয়ে তার চেয়ে তুমিই আমায় মেরে ফেলো নিজের হাতে !

শ্রান্ত ক্লান্ত চোখে চেয়ে থাকে নরহরি। বিষণ্ণ বিপন্ন ভাবে। কোথায় যেন ছোটো একটা ছেলে কাঁদছে। এ বাড়িতেই বোধ হয়, তার ছেলেটাব মতো গলা। অন্যেব কাছে থাকতে না চেয়ে মার জন্যই বোধ হয কাঁদছে।

স্টেশন রোড

শহরের বাজার অঞ্চলের রাস্তা থেকে যেন খানিকটা মাইল তুলে এনে বসিয়ে দেওযা হয়েছে একটা মাথা স্টেশনে ঠেকিয়ে। ফাঁকা মাঠ আর খেতের মধ্যে দু মাইল দূরের শহরটার একটুকবো একটা খাস্তা নমুনার মতো। দু মাইল দূরেও শুধু আরম্ভ শহরের, ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে স্টেশন রোড সেখানে আপিস আদালত এলাকায় পৌঁছে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে গেছে এদিক ওদিক। স্টেশনেব কাছের নমুনাটা শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলের, যেখানে দোকানপাট বাজারহাট।

স্টেশন ঘেঁষে স্টেশন রোডের এই নোংরা ঘিঞ্জি সমৃদ্ধির সেটাই আসল কারণ। চারিদিকে ছড়িয়ে পাতা আছে আইনি মামলার জাল, এ শহরটা তার জেলা কেন্দ্র। প্রতিদিন বহুলোক আসে চাবিদিক থেকে, ট্রেনে এবং বাসে, পায়ে হেঁটে প্রদেশ থেকে প্রদেশে টানা সুদীর্ঘ সরকারি পথটা দিয়ে বাস চলাচল করে মহকুমা থেকে মহকুমা শহরে, লাইনের ওপারে স্টেশন। সামনে দাঁড়িয়ে জল নিযে জিরিয়ে আবাব রওনা দেয়। বাসের যাত্রীদেরও শহরে যাবার পথ এই স্টেশন বোড। মামলা ছাড়া নানা কাজে অকাজেও মানুষ শহবে আসে। ফেরার তাগিদে অনেকে সময় পায় না শহরেব অতদূর বাজাবে গিয়ে কেনাকাটা করতে। এমন মানুষও থাকে অনেক যারা কেনাকাটার কথা ভুলে থাকে সামনে দোকানপাট নজবে পড়া পর্যন্ত ! দোকান দেখে আচমকা কিছু কেনার শখও জাগে কারও কারও, সঙ্গেব পয়সাব কামড়ানিতে। তা ছাড়া প্রতিদিনই থাকে কমবেশি একদল অসময়ের যাত্রী, একটা ট্রেন আসে বাত সাড়ে বারোটায় অরেকটা তিনটেয়। ভোর পাঁচটায় বাস ছাড়ে একটা। এ সব যাত্রীরাও তো বসবে খাবে শোবে ঘুমোবে জিনিস কিনবে, দরকাবি বা শখের। কেউ নেশাও চাইবে, কেউ মেয়েলোক। শ্রান্ত ক্লান্ত মর্মাহত দিশেহারা গেঁয়ো চাষি অন্তত এক ভাঁড় চা তো চাইবে মবিয়া হযে। তা ছাড়া, লাইনেরই ওপারে আছে কয়েকটা শালকাঠ আর শালপাতা চালানের কাবখানা-গুদাম। এ জেলায় এ ব্যাবসাটা খুব ফলাও। মালিকেরা এবং বাবুরা শহর থেকে গাড়ি সাইকেলে, যাতায়াত করেন। যারা খাটে তারা পাশেই থাকে বেশির ভাগ। শহরের বাজার অনেক দূর হয় তাদের পক্ষে।

শহরের খাস বাজারের প্রায় সব কিছু কেনাবেচার ব্যবস্থাই তাই আছে স্টেশন রোডের এই ছোট্ট নকল শহরে, বড়ো বড়ো দালান আড়ত আর দোকান ছাড়া। পান বিড়ি সিগারেট, চা শরবত, মিষ্টান্ন, চিড়ামুড়ি, পবিত্র হিন্দু হোটেল, সামসুদ্দীনের নামহীন খানাপিনা বাস-বসতেব আস্তানা, মুদি আর মনোহারি, পবিত্র হোটেলটার পিছনে লাইসেন্সপ্রাপ্ত করালীচরণের দেশি মদ, নুবুলেব কাচ এনামেল এলুমিনিয়মের বাসন, রসিক সা-র জামা কাপড় চাদব গামছা, নুবুল ও বসিকের দোকানেব মাঝখানের তিন হাত ফাঁক দিয়ে গিয়ে পিছনের ন্যাড়া বটগাছটার তলে সকালে বিকালে মাছ তরকারি, কয়েকটা টিনের চালাঘরে দেহ-বেচা স্ত্রীলোক, ঘনশ্যামের চপ কাটলেট বেচা 'বাবুজ রেস্টুয়ারেন', কানাই কম্পাউন্ডারের নিউ কিউর ডিসপেনসারি, ধীরেন কবিরাজের মহামায়া ঔষধালয়, তরফদারের জলচিকিৎসা ও হোমিওপ্যাথি—কী নেই !

পাল্লায় অবশ্য হার মানে শহরের সঙ্গে স্টেশন রোড, সে কথা বলাই বাহুল্য, শহরের বাজাবে আসল কারবার পয়সাওয়ালাদের, এখানে মাতব্বরি গেঁয়ো চাষি আর কাঠকাটা পাতা-বোনা খাটুয়ের, দোকানের চাকর মুনশি পান বিড়িওলার, দু-একজন ইঞ্জিনের ড্রাইভার ও খালাসির, টিকিটবাবু ও কুলিদের। তবু আরেক পাল্লায় পুষিয়ে নেয়। যতই ধুমধাম সমারোহ থাক শান্ত রাত্রে শহরের বাজার এলাকায়, স্টেশন রোডের এ জিনিস নেই, এমন জীবন্ত বৈচিত্র্য। দিনের শেষে স্টেশন রোড ঘুমের

দেশে যায় না, কর্মব্যস্ততার অবসানে শুরু করে অবসর যাপন, আত্মপ্রকাশ, চেনা-অচেনা প্রাণের যোগাযোগ। শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্য নতুন মানুষ এসে ঠেকে যায় এখানে রাত্রির জন্য। যাত্রার দল, কবিওয়ালা, সাধু বৈষ্ণব ফকির। মাঝে মাঝে অনেক রাতে জমে ওঠে বাছা বাছা পালার বাছা বাছা গানওয়ালা অংশ, কবি গাওন, একতারা বা তিনতারার সাথে গান, ছড়া বা পাঁচালি। গণেশ অপেরা যাবে পাটসাহীর জমিদারবাবুর মেয়ের বিয়েতে দু রাত্রি পালা গাইতে, ভোর ভোর রওনা দেবে গোরুর গাড়িতে, রাতটা কাটাবে এখানে। স্টেশন রোডের মানুষরা খুশি। খাওয়া শোওয়ার খাসা ব্যবস্থা করে দেয় সবাই মিলে চাঁদা করে।

গানটান শোনাও দু-চারখানা ?

অধিকারী দিনকাল বোঝে, হালচাল জানে। ক্ষুদিরামের ফাঁসির কালেও বুঝত, হরিশ্চন্দ্রের পালায় ঢুকিয়ে দিত ফাঁসির গান, আজ আরও বেশি বোঝে। পুরাণ আছে, রাধাকৃষ্ণের বিরহ প্রেমও আছে, কিন্তু আরও বেশি করে ফলাও হয়ে বজায় আছে ওই ফাঁসির গানের ধারা। সে বলে, মতি ? এই ছোঁড়া শুনছিস ? সেই গানটা শোনা দিকি। পয়সা না পাই পুণ্যি আছে। ইস্টিশানে রাত কাটাতে এত আদর এত দরদ বাপেব জন্মে পেইছিস শালা কোথাও ? গা ব্যাটা, গা। প্রাণ খুলে গা।

নিজে সুর করে গেয়ে অধিকারী ধরিয়ে দেয়—

রোদে জলে খাটি খাটি
আপন দেহ করে মাটি,
মাগো মাটি সোনা খাঁটি
তোমার বুকে ফসল ফলায়।
রক্ত মাসের সার দিয়ে মা,
গরিব চাষি ফসল ফলায়॥

ইংরেজ রাজাব ছানা
জোত জমিদার দৈত্য দানা
সেই ফসলে দিয়ে হানা,
চাষির মাথায় ডান্ডা চালায়।
পুলিশ চালায় গুলি মাগো,
পাক পিয়াদা ডান্ডা চালায়॥

বাইরের গাইয়ে মানুষ বা দল কেউ না থাকলে নিজেরাই আসর জমায়, গান হয় পুরানো হারমনিয়ম বাজিয়ে। সামসুদ্দীন আর ময়রা দোকানের বনমালী গাইতে জানে। সামসুদ্দীনের জবর গলা, সে গান ধরলে চারদিক গমগম করতে থাকে। বিনা আহ্বানে বিনা আয়োজনে মাঝে মাঝে জমায়েত হয় অন্যরকম, টিকিটবাবু, মনোহর বা নিতাই কম্পাউন্ডার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনর্গল কথকতা করে যায়, চারিদিক থেকে বাঘ কুমির কেউটের মতো দাঁত খিঁচিয়ে ফোঁসফোঁসিয়ে মরণ কী ভাবে করছে তার চরম অভিযান আর চিরদিনের মৃত্যুমুখী জীবন কী ভাবে লড়ছে তাদের দাঁত ভাঙতে, ফোঁসফোঁসানি থামাতে। সব চেয়ে জমে এই জমায়েত। দুরকম ভাবে জমে দুজনের এই কথকতায়। মনোহরের গুরুগম্ভীর বর্ণনায় গা ছমছম করে শ্রোতার, কথার আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠে হৃদয়, তীব্রতায় আগুন ধরে যায় রক্তে, দাঁতে দাঁতে চেপে হাত মুঠো করে ফেলে অনেকে। নিতাই আবার অন্যরকম, সে থেকে থেকে সকলকে হাসায়, বুকে জ্বালা ধরিয়ে শুধু মুখে হাসায়। আগাগোড়া তার কথা ও সুর হয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হাসি-তামাশার কিন্তু তারই ঝাঁঝে আঁতে যেন ছ্যাঁকা লাগে সকলের। তারা হাসে যেন সায় দিয়ে যে ঠিক ঠিক, ও সব দলন পেষণ নিছক রসিকতা প্রজার সাথে রাজার, গরিবের সাথে বড়োলোকের, আমরা আমরা বুঝি ও রসিকতা, আমরাও জানি রসিকতা করতে !

কিছুই ওলটপালট করতে পারে না স্টেশন রোডের নৈশ জীবনের স্বকীয়তা। চেষ্টা করে কেউ এটা গড়ে তোলেনি, বিপর্যয় বিক্ষোভ নির্যাতন মন্বন্তরের মধ্যে আপনা থেকে সৃষ্টি হয়ে গেছে এখানকার পথাশ্রয়ী জীবনের এই আত্মপ্রকাশের ভঙ্গিটা। দীর্ঘ ব্যবধানে মাঝে মাঝে জোবে নাড়া খেয়েছে, যাব মধ্যে সব চেয়ে জোরালো ছিল একুশ আর ত্রিশ সালের সেই আলোড়ন, বিশ-পঁচিশহাজাব মানুষ যখন এখানে ভিড় করত নেতাকে দর্শন করতে, অভ্যর্থনা কবে শহরে নিয়ে যেতে ! দুবার গভীর রাত্রে আর একবার ভোরে পুলিশ আচমকা ঘিবে ফেলেছে স্টেশন আব স্টেশন রোড,—সন্ত্রাসী যুগের বিপ্লবী ধরতে। তিনবারই শিকার ফসকে যাওয়ায তন্নতন্ন খুঁজে লন্ডভন্ড করে দিয়ে গেছে স্টেশন রোডের আনাচ-কানাচ। আবাব ঝিমিয়ে শান্ত হয়ে একভাবে চলতে শুরু করেছে জীবন, প্ল্যাটফর্মের কাঁকরে পথের ধুলায় যাত্রীর পদক্ষেপ, গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়া নিযে ঝগড়া, দোকানে দোকানে দরাদরি কেনাবেচা, হোটেলের সামনে কুকুরের কামড়া-কামড়ি, অপরাহ্ণে শ্রান্ত অবসন্ন যাত্রীব প্রত্যাবর্তন, সন্ধ্যার পর নকল করা সদর বাজারের মাতালের হল্লা, স্ত্রীলোকেব চিৎকার, একে একে বন্ধ করা দোকানের ঝাঁপ কপাট, স্টেশনের পাকা মেঝেতে আর হোটেলে তক্তপোশের মাদুবে চাদব জড়িয়ে যাত্রীদের শুয়ে বসে ঝিমিয়ে আসা, তার মধ্যে এখানে ওখানে ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েকজনেব জেগে থাকা তাস জুয়া খেলে অশ্লীল গান গেয়ে। সাড়ে বারোটাব গাড়ির যাত্রী জানালায় কপাট কুটে টিকিটবাবুকে জাগিয়ে শেষ মুহূর্তে টিকিট পায়, গাড়ি থেকে যাত্রী নেমে দেখতে পায একটু যে সাড়া জাগিয়েছিল স্টেশনে গাড়িটা এসে, গাড়ি চলে যাবার পর দেখতে দেখতে তা ঝিমিয়ে গেল। সে সব বদলে দিয়ে গেছে গত বছরগুলি। আলোহীন অন্ধকার স্টেশন রোডে দূর গাঁযেব যাত্রী তাব গাঁয়ের স্বাধীন হবার কাহিনি বয়ে নিয়ে এসেছে, সঙিন বুলেটেব বেড়াজালে ঘেরা গাঁযের পুড়ে ছাই হবার বিবরণ। আহত শোকাতুর সর্বস্বান্ত মানুষ ছিটকে এসে আছড়ে পড়ে গুমবে গুমরে কেঁদেছে এখানে, অভিশাপ দিয়ে দিয়ে ফুঁসছে। ভিড় করে এসেছে খাদ্যের সন্ধানে বুভুক্ষু নরনারী, স্টেশনে স্টেশন রোডে মাথা গুঁজে মরেছে ! ওদের খিচুড়ি দিয়ে ওষুধ দিয়ে বাঁচাতে এসেছে একদল ছেলেমেয়ে, স্টেশন রোড চেয়ে চেয়ে দেখেছে কতটুকু উপকবণ নিযে ওদের কতবড়ো অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রাণপণ চেষ্টা। লাইনের ওপারে বাস চলার পথ ধবে হাজার অর্ধ উলঙ্গ মানুষের শোভাযাত্রা এসে এই স্টেশন রোড বেয়ে এগিয়ে গেছে ম্যাজিস্ট্রেটেব বাংলো ঘেরাও করে বস্ত্রেব প্রতিশ্রুতি আদায় করতে। পাটগড়েব চাষি-বিদ্রোহের নমুনা স্বরূপ চালান এসেছে এগারোটি আহত ও পাঁচটি মৃতদেহ, বাত সাড়ে বারোটা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি শুয়ে থেকেছে শহরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থার অভাবে। এখানকার বলাই দেখে এসেছে কলকাতার ছাত্রদেব শুধু হাতে গুলির বাধা ভেদ করে এগোনো। এই সেদিন সামসুদ্দীন দেখে এসেছে উনত্রিশে জুলাই সারা কলকাতার হরতাল, কাক চিলটি পর্যন্ত আকাশে ওড়েনি !

চারিদিকের মানুষের পদার্পণ ঘটে স্টেশন রোডে। চারিদিকের আলোড়ন এখানে ঢেউ তোলে।

নিতাই ছিল শহরে সুরেশ ডাক্তারের মস্ত ডাক্তারখানার কম্পাউন্ডার সেলসম্যান। বড়ো দরকারটার সময় ডাক্তারখানার আলমারি থেকে আড়ালে চলে গিয়েছিল দরকারি ওষুধের মোটা স্টক। ওষুধের অভাবে মানুষ মরছিল স্টেশন রোডের রিলিফ হাসপাতালে। একদিন হঠাৎ উধাও হয়ে যায় সুরেশ ডাক্তারের চোরা বিক্রির হিসাবে অন্তত দশ হাজার টাকার সেই ওষুধ—সারা শহরে পোস্টার দেখা দেয় সুরেশ ডাক্তারের বদান্যতার, স্টেশন রোডের রিলিফ হাসপাতালে তিনি এগারোশো টাকার ওষুধ দান করেছেন, নিজের কম্পাউন্ডারকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য পুরা বেতনে ছুটি দিয়েছেন রিলিফ হাসপাতালে কাজ করার জন্য ! সুরেশ ডাক্তারের দু-পাটি দাঁতই বাঁধানো, নিজের হাত পা কামড়ে নতুন দাঁত কিনতে হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

সে ওষুধ শেষ হয়ে গেছে কবে। রিলিফ হাসপাতালও উঠে গেছে। এখানে ছোটো ডিসপেনসারিটি খুলে বসেছে নিতাই, বিক্রি খুব, কিছু খয়রাতও যায়।

মনোহর বলে নিতাইকে, এ বদনাম তোমার ঘুচল না, সুরেশ ডাক্তারেব দানের ওষুধ গাপ করে দোকান দিয়েছ। সারদা উকিল টিকিট কাটতে কাটতে বলছিল কী, বেশ তো উন্নতি হয়েছে নিতায়েব ডাক্তারখানার, এ যুগে চোরেরই কপাল খোলে !

চোর আর বাটপাড়ের, নিতাই হাসে, বদনাম ঘুচবে কি, আজও কি ভুলতে পেরেছে ডাক্তারবাবু গায়ের জ্বালা ? এখনও বলে বেড়ায়। মেয়ে চোরকে মাফ করেছে, আমায় ভুলতে পারে !

নিতাইয়ের জায়গায় নতুন যে কম্পাউন্ডার এসেছিল, সুরেশ ডাক্তারের একটি মেয়ে তার সঙ্গে পালিয়েছিল পিরিতের স্বাধীনতা প্রকাশ করতে।

সামসুদ্দীন খবর জানতে আসে, গাড়ি লেট হবে নাকি ?

বেশি না, আধঘণ্টা।

কলকাতার গাড়ির জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে কয়েকদিন ধরে সকলেই। টাটকা খবর পাওয়া যাবে সেখানে অবস্থা কী বকম।

নিতাই বলে, খপর আর কী, সেই খুনোখুনি। বাবা এম্পায়ারেব সেকেন্ড সিটি, আগে স্বাধীনতা না বাগালে মান থাকে ?

ইস, আপশোশ কবে মনোহর, সব ভেস্তে যাবে।

খোদা নারাজ, জানা গেল খোদা নারাজ ! সামসুদ্দীন সায় দেয়।

গাড়ি আসে, অনেক গুজব ও টাটকা খবব নিয়ে। খবর শুনে ম্লান হয়ে যায় উৎসুক মুখগুলি, উদ্‌বেগের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

গাড়ি ছেড়ে যাবার পব মনোহর ব্যস্তভাবে বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বলে, পদ্মলোচনকে নামতে দেখলাম মেয়ে নিয়ে।

চলে গেল নাকি ?

ওই যে হোথা।

একপাশে ঝুলিঝোলা ঠিকঠাক করে পদ্মলোচন তারের যন্ত্রটার কাপড়ের ওয়াড় খুলছিল। বেঁটে খাটো এস্রাজের মতো আকার যন্ত্রটার। সবু মোটা দুটি মোটে তার, মীড় বাঁধা নেই, বেহালার মতো ছড় টেনে বাজাতে হয়। এগাবো-বারোবছরের মেয়েকে সাথে নিয়ে পদ্মলোচন এই যন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। মেয়েটিব গলা আশ্চর্যরকম মিষ্টি। পদ্মলোচনের মোটা গলা আর তারের মিহি বাজনাব সঙ্গে সুব মিলিয়ে তার চিকন কচিগলার গান আবেশ ও আরাম এনে দেয় কানে। লোকে দাঁড়িয়ে গান শোনে তাদের, যেচে পয়সা দেয়। রোজগার মন্দ হয় না। আগে তারা দুবার স্টেশন বোডের নৈশ আসরে গান গেয়ে গেছে।

চললে নাকি ? মনোহর বলে, থেকে যাও না আজ ; চাঁদা তুলে দেব।

আজ না বাবু, মনোহর বলে সবিনয়ে, ফেরার দিন থেকে শুনিয়ে যাব। শহরে চলি আজ। হাঙ্গামা নেই তো বাবু শহরে ?

না ! হাঙ্গামা কীসের ?

খুব জোবের সঙ্গে ভরসা দিয়ে বলতে পারে না মনোহর যে কিছু হবে না। চারিদিকে গুজব আর উসকানি। এসে ছুঁয়েছে স্টেশন রোডকেও, আমল পায়নি। এসেছে শহর থেকে।

এ শহরে এলে পদ্মলোচন অন্তত আট-দশদিন কাটিয়ে যায়। কিন্তু পরদিন বেলাবেলি সে ফিরে আসে স্টেশনে মেয়ের হাত ধরে হন্তদন্ত হয়ে। ছোটোখাটো একটা হাঙ্গামা বেধেছিল বাজার এলাকায়

সামান্য একটা উপলক্ষ নিয়ে, গুজবে ফেঁপে সেটা চারিদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। অনিশ্চিত ভয় ও অবিশ্বাস ছায়ার মতো আগে থেকেই ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে। হাঙ্গামা শেষ হয়ে গিয়েছিল অল্পেই। গুজবও ফেঁসে যেত আপনা থেকে বাস্তব আশ্রয় না পেয়ে, আতঙ্কও অনিশ্চিত হালকা ছায়ার মতো শুধু বাতাসেই ঘুরে বেড়াত। একশো চুয়াল্লিশ আর সাঁঝবাতি জারি হওয়ায় গুজব আর আতঙ্ক দুটোই সত্য হয়ে উঠেছে। খাদ্য ও বস্ত্র কমিটির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার উদ্দেশ্যে বড়ো একটা সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল আজ, সেটা বাতিল হয়ে গেল।

পদ্মলোচন একা নয়, অসময়ে স্টেশন আর স্টেশন রোড ভরে যায় সাড়ে পাঁচটা ও সওয়া সাতটার গাড়ির যাত্রীর ভিড়ে। অবসাদের ছাপ নেই, শুধু ভয় ও ভ্রান্তির বিহ্বলতা ! আপশোশ ও বিরক্তি। গাঁয়ের মানুষ গাঁয়ে ফিরে যেতে ব্যাকুল। এ জেলার মফস্‌সল অঞ্চলে কোনো কোনো গাঁয়ে সাম্প্রদায়িক কলহের সুদূর সম্ভাবনাও নেই, একসাথে গাঁয়ের লোক অন্য এক ভয়ংকর লড়াই লড়েছে, এত সহজে তার স্মৃতি ভুলবার নয়, অনেক ভিটেতে ছাই সরিয়ে আজও ঘর ওঠেনি। এই শহরকে শুধু খানিকটা উর্বরা করেছে রাজনৈতিক আবর্জনার পচা সার, আত্মহত্যার বিষের চারা যাতে গজাতে পারে, বৃক্ষ হয়ে উঠবার আগেই শুকিয়ে মরে যাবার সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে।

টিকিট ? মনোহর বলে প্রায় ধমক দিয়ে, টিকিট কেন পদ্মলোচন ? ফেরাব দিন গেয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে !

কিন্তু টিকিটবাবু—

ভয় নেই। স্টেশনে থাকবে। পাঁচ টাকা চাঁদা তুলে দেব।

অমৃত আর সামসুদ্দীন ঘুরছিল চারিদিকে যাত্রীদের মধ্যে, তারাও পদ্মলোচনকে ভরসা দিয়ে বলে, স্টেশনে ভয় কী তোমার ?

সওয়া সাতটার গাড়ি চলে যাবার পর স্টেশন প্রায় ফাঁকা হয়ে আসে, পড়ে থাকে শুধু দশটা আর সাড়ে বারোটার গাড়ির কিছু যাত্রী। দুটি ভদ্র পরিবার ওয়েটিং রুমে আশ্রয় নিয়েছে। সকলের আগেই এরা দু-একটা ব্যাগ পুঁটলি সুটকেস নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় স্টেশনে ছুটে এসেছিল প্রথম যে গাড়ি পাবে তাতেই পশ্চিমে রওনা দেবে বলে। এখানে এসে একটু ধাতস্থ হয়েছে। উকিল সারদাবাবুর ভাই বরদা এককালে মনোহরের ক্লাসফ্রেন্ড ছিল। মনোহরের সঙ্গে কথা বলে ফিরে গিয়ে বরদা নিজের ও অন্য পরিবারের লোকগুলির সঙ্গে কথা বলার পর বিশেষভাবে দিশেহারা ভাবটা কেটেছে তাদের। মালপত্র ছাড়া বিদেশে গেলে সত্যই বড়ো কষ্ট হবে, খালি বাড়িতে জিনিসপত্রও তছনছ হয়ে যাবে হয়তো। স্টেশনে ভয় নেই। একটু দেখা ভালো। কাল গাড়িতে উঠলেই হবে দরকার যদি হয়।

স্টেশন ও স্টেশন রোডে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা এসে গিয়েছে সন্ধ্যার আগেই। টহল থামিয়ে তারা ঘাঁটি আগলে বসে সা-র দোকানের রোয়াকে আর স্টেশনের সাধারণ লোকের চারিদিক খোলা সাধারণ বিশ্রামাগারে—স্টেশনে ঢুকবার পথও সেটা। ধাক্কা সামলে দ্রুত আত্মস্থ হতে থাকে স্টেশন রোড। মুখে মুখে জানাজানি হয়ে যায় যে পদ্মলোচন আর তার মেয়ে উপস্থিত আছে, নতুন নতুন গান বেঁধেছে পদ্মলোচন। নতুন গান ?

ভোর হল, গোঠে চল, ও ভাই বলাই।
খেলায় কাল হারিয়েছি বলে রাগ করিতে নাই।

—এই বলে গান শুরু করে গতবার পদ্মলোচন গেয়েছিল।—

ভাবছ কেন কলির কথা,
(যখন) প্রজায় রাজায় নাই মমতা,
বলি শোনো সে বারতা,
তোমারে বলাই।

ভোর হল, গোঠে চলো যাই।
আজকে যারা পুণ্যবলে,
রাজা হয়ে প্রজা পালে,
(তারাই) কংস হয়ে কলিকালে,
জন্মাবে ঠাঁই ঠাঁই।
মর্ত্যভূমে জন্ম নেবার
দুঃখ শেষ হবে আমার,
প্রজারূপে শেষ অবতার
হবে আমার তাই।
ভোর হল, বেলা হল, গোঠে চলো ভাই।.

পদ্মলোচন নতুন গান বেঁধেছে। কে জানে কী গান ? অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ স্টেশন রোডের। ভাড়া-খাটা স্ত্রীলোক কটি পর্যন্ত বলে তাদের দেহের ভাডাটেকে, তা হবে না বাবু, শুনতে আমি যাবই, টিকিটবাবু কম্পাউন্ডারবাবু কইবে আব পদ্মলোচন মেয়ের সাথে গাইবে, ও না শুনে পারব না। না পোষায়, পয়সা ফিরে নাও, অন্য ঘরে যাও !

সামসুদ্দীন তাগিদ দেয় তার নামহীন সরাইখানাব খাটুয়েদের, চটপট সারো, একটা দুটো গাইতে হবে আজ।

খাইয়েদেব বলে, না, না, যাব, আল্লা রসুল, জান কবুল। হেথা ও সব কিছু নেই, একদম নেই। চলেন দেখবেন, মালুম হবে।

প্রত্যাশা উৎসাহ আগ্রহ আয়োজন দেখে মনে হয় আজ বোধ হয় আরও বেশি জমজমাট হবে স্টেশন রোডেব নৈশ আসর অন্যদিনেব চেয়ে। গাড়ি-তলাউ-এ লোক জমে আজ অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু পদ্মলোচন সবে তাব তারের যন্ত্রের কান মোচড়াতে আরম্ভ করেছে, বাধা আসে।

এ সব চলবে না। একশো চুয়াল্লিশ, সাঁঝবাতি জাবি হয়েছে। এত লোকের ভিড় চলবে না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে সকলকে ফিরে যেতে হবে যার যার এলাকায়। নইলে—

থমথম গমগম করে চারিদিক। পদ্মলোচনের মেয়ে দুবার কাশে, মুখে আঁচল চাপা দেয়। মনোহর হঠাৎ উঠে বলতে শুরু করে, ভাইসব আমরা এ অন্যায় হুকুম মানব না, আমরা—

নিতাই কম্পাউন্ডার বাঁ হাতটা চেপে ধরে তার মুখে, ডান হাতে কাছা ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে বসিয়ে দেয়।

যাত্রাদলের সং-এর ঢং-এ বলে, এই তো ব্যাপার ! কিন্তু একটু গান বাজনাও কি বারণ ?

জবাব আসে গর্জনে।

বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা নিতাই বলে সং-এরই ঢং-এ গর্জনের মিড়ে গলা চড়িয়ে, তাই হবে। মোরা আইন মানব। টাউন এলাকার আইন মোরা টাউন এলাকায় আলবত মানব। চলো ভাই, মোরা টাউন ছেড়ে যাই। লাইনের ওপারে টাউন নাই। চলো সবাই, আইনও বাঁচাই, গানটানও গাই।

সকলের দ্বিধা দেখে জীবনে বোধ হয় এই প্রথম রসিকতা ভুলে নিতাই ধমকে ওঠে, গোরু-ছাগল নাকি ? কথা বোঝো না মানে বোঝো না, না? চটপট চলো—রেল লাইনের ওপারে।

প্রদেশ থেকে প্রদেশে টানা সরকারি রাস্তার গায়ে লাগা টাউন এলাকার বাইরের গ্রাম চিলজলা। কাদা শুকিয়ে গেছে বর্ষান্তের মাঠের। তাছাড়া, কে এখন মানছে শুকনো কাদা না ধুলো না ঘোড়ার নাদিতে অপরিচ্ছন্ন গাড়ি-তলাউ। সামসুদ্দীন তার নামহীন সরাইখানা থেকে ডে-লাইটটা এনে টাঙিয়ে দেয় মরা গাবগাছটার ডালে। হারমনিয়ম বাজিয়ে সেই শুরু করে একশো চুয়াল্লিশ আর

সাঁঝবাতি আইন এলাকাব একশো গজ দূবে স্টেশন বোডেব নিস্তব্ধ গান, আজ আমাদেব শুবু বে ভাই

তাবপব পদ্মলোচন গান ধবে তাব তাবেব যন্ত্র বাজিযে
তুমি যে দুখীব ভগবান,
এতদিনেও মিলবে কি প্রমাণ—
তাব মেযে গায মিষ্টি চিকন চডা মিহি গলায
বাঁচন মবণ তোমাব বিধান,
হে ভগবান,
নিজেব বিধান মানো নইলে হয বেমানান—

space ⟶

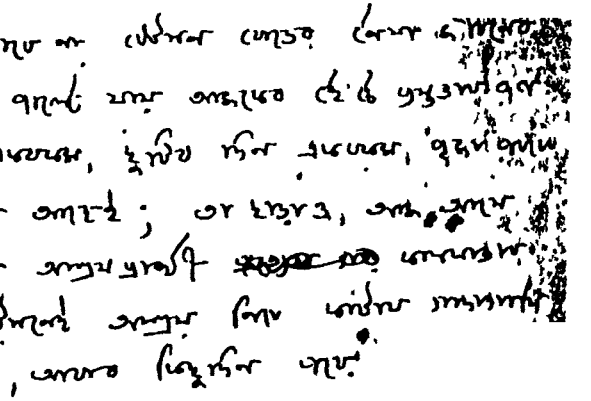

স্টেশন বে ড গল্পেব পাণ্ডুলিপি পৃষ্ঠা

পেরানটা

বঁধুর লেগে পেরানটা যে কাঁদে, আহা কাঁদে।

তেপান্তরের মাথাভাঙা মাঠে গলা ছেড়ে দিয়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গান গাওয়ার কী যে আরাম। গতি তার মন্থর হয়ে আসে। অবেলায় অঘ্রানের পড়ন্ত রোদ, শান্ত ফাঁকা মাঠে একা একা বোধ করছিল সাধু শেখ। তাই গুনগুন করে গান ধরে ফেলেছিল নিজেরই অজান্তে। দেখতে দেখতে গলা খুলে সুর চড়েছে। তা মন্দ মানুষের কি গুনগুনিয়ে গাওয়া পোষায় মেয়েলোকের প্যানপ্যানানির মতো ?

শক্ত মাটি মাঠের, লাঙল দিলে ফলা ঢুকবে না, তবু এ মাটি আঁকড়ে কামড়ে দূর্বা ঘাস ছেয়ে আছে চারিদিক, যদিও তাবা রুক্ষ জীর্ণ কমতেজি। এ মাটিতে বুঝি শিশিরও শোষে না। বৃষ্টির জলও ভেতরে পশে না, ওপর ওপর মাটি ভিজিয়ে পশ্চিম দিকে ঢাল বেযে গড়িয়ে গিয়ে কাঁসাই নদীতে বন্যা ডাকায়। এমনিভাবে যদি ধান গজাত, এই দূর্বাঘাসেব মতো, যেখানে মাটি সেইখানেই ! সরেস মাটিতে তেজি সবুজ ঘন হয়ে, শক্ত পতিত জমিতেও না হোক যা হোক এই মাঠের ঘাসের মতো ! কোনো শালার তা হলে আর শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে চষতে হত না পাজি বজ্জাত নিমকহারাম পরের খেত, হাজতখানায় বসবাস হত না ফসল নিযে কামড়াকামড়ি কবে ! মাঠে ঘাটে খেতে আলে বনবাদাড়ে আপনি গজানো অজস্র ধানগাছে থইথই করত চারিদিক ? কাটো, মাড়াও, ঢেঁকিতে নয় কলেছাঁটাও, দুবেলা পেট ভরে যার যত খুশি ভাত খাও সারা বছর, গোরু-ছাগলকে খাওয়াও !

গলা তার আবও চড়ে যায়, আরও কাঁপে।—বঁধুর লেগে পেরানটা মোর কাঁদে, পরান বঁধুরে !

এ গান সে জানে এক লাইন, সুর জানে এক লাইনের। অন্য গানও জানে, এমনি এক লাইন দু লাইন। একা না হলে তাই সে গান গায় না, এমনি ফাঁকা মাঠ না পেলে গলা ছাড়তে পাবে না। ধানের ভাগ নিয়ে লড়াই করে জেল খেটে গাঁয়ে ফেবার পথে এই মাথাভাঙা মাঠে তার দরকার ছিল গলা ছেড়ে গান ধরার।

দূরে দূবে গাছ-ঢাকা গাঁ। মাঠে এখানে ওখানে থোকা থোকা নিচু ঝোপ, বুনো কুল, কুকুরশোঁকা, ঝাঁকাটি গাছের। দক্ষিণে নদীর ওপারে ঘন শালবন। শুকনো ঠান্ডা বাতাস বইছে ওদিকে হাতে মুখে খসখসে ছোঁয়াচ লাগিয়ে। নদী শুকিয়ে গেছে এব মধ্যেই, চওড়া বালির বুকে এখন ঝিরঝির বইছে আধমরা ক্ষীণ ঝরনা।

আল্লা, আজ নমাজ পড়ার সময় নাই ! ধুলায় ধূসর গা হাত পা নদীতে গিয়ে অজু করে নমাজ পড়তে গেলে এই জনহীন ফাঁকা মাঠে তাকে ঘিরে আঁধার রাত নেমে আসবে, চারিদিকে তাকে ঘিরে শুরু হবে বিপথের ইশারা আব হাতছানি, তার হাতিয়াদল গাঁয়ের পথের দিশা সে হারিয়ে ফেলবে বেমালুম।

আঁধারকে সে ভয় করে না। এক বছর আগে যখন দিনান্তের নমাজ পড়ার জন্য আল্লার এই জগৎটাকে বরবাদ করে দিতে পারত, তখন ভয় করত এই জগতের আঁধারকে। বনবাদাড়ে কত আঁধার রাত কাটিয়েছে ফসলের লড়াইয়ে নেমে, কত নমাজ পড়া তার বাদ গেছে তারপর। আঁধারের ভয় কেটে গেছে। তবে ওই সূর্য অস্ত গেলে এ মাঠে সে দিক হারিয়ে ফেলবে, চেনা চেনা চিহ্নগুলি দেখতে পাবে না, কোনোদিকে এগোলে তার গাঁ ঠাহর পাবে না। দিনের আলোয় পথ চিনে তাকে পৌঁছতে হবেই গাঁয়ের কাছাকাছি।

গানের অজুহাতে ক্লান্ত ব্যথিত পায়ে ঢিল পড়েছিল। বেলার দিকে চেয়ে আবার সে জোরে চলা শুরু করে। সূর্য শালবনে ডুবুডুবু। যেখানে তারার আলোতেও তার হাতিয়াদল গাঁয়ের পথ খুঁজে নেওয়া যায় সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে কি সময়মতো ?

অঘ্রানের সন্ধ্যায় গা ঘেমে যায় সাধু সেখের, তৃষ্ণায় শ্রান্তিতে ভারী মনে হয় দেহটা। আজ গাঁয়ে ঘরে পৌঁছতে না পারলে গাঁয়ে ফেরা হয় তো তার মিছেই হবে, একটা রাত ঘরে থাকতে পাববে না, গাঁয়ের লোকের সাথে আলাপ করতে পারবে না, ওয়ারেন্ট এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতেই সময় যাবে।

হাজতবাসের দিনগুলিতে কী ঘটেছে গাঁয়ে, কেমন আছে তার গাঁয়ের লোক আপনজন, কী করছে তার ফুলবানু, দেখে শুনে জেনে বুঝে না নিলে তো চলবে না তার !

চলতে চলতে রাত ঘনিয়ে আসে, অস্পষ্ট হয়ে আসে দিবা আর দিকচিহ্ন, হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় সাধু সেখ। দূরে, অনেক দূরে, ও কীসের আলো ? তারার চেয়ে স্পষ্ট হযে আকাশে ঝুলে আছে ?

আল্লা, রাজবাড়ির স্বাধীনতা উৎসবের ফানুস বাতিটাই শেষে তাকে গাঁয়ের পথ দেখাল ! আজও ওরা ওই বাতিটা জ্বালিয়ে রেখেছে ?

ওরা পারে। রাজবাড়িতে স্বাধীনতা উৎসবেব ফানুস বাতি দু-তিনমাস জ্বালিয়ে যেতে পাবে ! গাঁয়ে গিয়ে ঘরে গিয়ে সাধু দেখতে চায় ডিবরি পিদিম জ্বলছে কিনা তাদের ঘবে।

কুয়াশা ঘুঁটের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে গন্ধময় ঘন রাত নেমেছে হাতিয়াদলে। সবার আশায ভবা উৎসুক দিনটা শেষ হয়েছে হতাশায়। আজ আর তবে এল না মহীন শ্রীপতি সাধু সেখ। এস্তেআলি মিছেই তাদের ফাঁকা খবর দিযে দিয়ে ভুলিয়েছে যে ওরা তিনজনই ছাড়া পেযেছে, গাঁযে ফিবছে। সকালে ওদের নিয়ে সদর শহরে সভা শোভাযাত্রাব পালা, তারপব বওনা দিযে বিকেল নাগাদ তিনজনে পৌঁছবে। বিকেল ফুরিয়ে এলে মাথা নেড়েছে হাতিয়াদলের মানুষ। এত সহজেই যেন হাজত থেকে মানুষ খালাস পায় ডাকাতির দায়ে কযেদ হয়ে ! ডাকাতি করেছে না করেনি, মানুষ ওরা ভালো কী মন্দ সে তো আইনের প্যাঁচ বাবা, দায়ে তো ফেলেছে ডাকাতির। সাধুখাঁব আড়ত লুটে জেলে গিয়েছিল সুদাস ঘোষেরা। আজ ছ-সাত সাল কাটল, তারা ফিরেছে কি ? এমন আজগুবি খবব দেয কেন এস্তেআলি ? ঘরেবাইরে এস্তেআলির মুশকিল।

সে যত বলে কোনো কারণে হয়তো তাবা আটকে গেছে কাল নিশ্চয় ফিববে, গাঁযেব লোক বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে।

বলে, খপর দিত। তোমার মতো মোদের অত হেলাছদ্দা করে না, না এলে খপর দিত আজ এলোনি, কাল এসবে।

কিছুদিন আগেও সচ্ছল অবস্থা ছিল এস্তেআলির, ধানের সচ্ছলতা। তখন যা ছিল মানুষটার কঠিন একগুঁয়ে স্বভাব, আজ সবার কাছে তা হয়েছে হেলাছদ্দা, অবজ্ঞা ! মানুষটা সব কিছুতে যুক্তি খোঁজে, সোজাসুজি বিশ্বাস করা না করার চেষ্টা তার কাছে বিরক্তিকর অথচ তাকে আজ আগেব চেয়ে সমান মনে হয়।

নতুন চিন্তাচেতনা মত, তাকে নিয়ে তাই বিব্রত বোধ করে হাতিয়াদলের চাষি সমাজ।

তার নিকা বউয়ের তোতলামি আজ বেড়ে গেছে। ধৈর্য ধরে তার কথা শোনা আর মানে-বোঝা হয়েছে কঠিন ব্যাপার। তবে দু-চারবার শোনার পর টের পাওয়া গেছে জিজ্ঞাসা তার একটাই। সাধু সেখের সম্বন্ধে। উত্তেজনা আর তোতলামি বাড়ার কারণটাও তাই।

সাধু সেখের সে ভাতিজা, মেয়ের মতো তাকে মানুষ করেছে লোকটা। নিকার পরেও তোতলা ফুলবানু মশগুল হয়ে আছে মানুষটার বাপের বাড়ির দরদে। অনেক ভেবেচিন্তে এস্তেআলির সাথে

মেয়েটার নিকে বিয়েই স্থির করেছিল সাধু সেখ। বোকা হাবা তোতলা মেয়ে ফুলবানু, এন্তেং সাথেই তার বনবে ভালো। রূপযৌবনের কাঙাল এন্তেআলি, একদম পাগল বলা চলে। সাদি বউটা তার চালাক-চতুর কাজেকর্মে পটু, কিন্তু দেখতে মোটে তেমন নয়। অনেক বছর এন্তেআলিকে জমিয়ে রাখবে ফুলবানু। ততদিনে ছেলে হবে মেয়ে হবে, ঘরসংসার জমাট বেঁধে উঠবে। পাগলামিও কমে যাবে এন্তেআলির।

ফুলবানু ঘর করতে এসেছিল কেঁদেকেটে সর্দিভরা নাকের নোলক ছিঁড়ে রক্তপাত করে। তার আহ্লাদ আবদার সমানই বজায় আছে। চোত-ফাল্গুনে তার বাচ্চা হবে।

সাথে করে না এলে কীসের জন্য ?—এই হল মোট জিজ্ঞাসা ফুলবানুর। তার পেরানের আসল জিজ্ঞাসাটা বুঝতে সাঁঝ পেরিয়ে গেছে এন্তেআলির। আগে একা না চলে এসে এন্তেআলি যদি সাধু সেখকে ফুলবানুর দোহাই দিয়ে সাথে নিয়ে আসত, ফের কিছু একটা কাণ্ড করে বসার সুযোগ পেতনা সাধু সেখ। নিশ্চয় সে ফের হাজতে গেছে, নয় গুলি খেয়ে জখম হয়েছে, নইলে এল না কেন ? এত দূর থেকে প্রাণের টানে ফুলবানু টের পেয়েছে। সাধু সেখের জন্য মুরগি যে রেঁধেছে ফুলবানু, এখন তা খাবে কে ?

এটা আন্দাজ করে ভড়কে যায় এন্তেআলি। কলকের গুলপোড়া তামাকের ধোঁয়া টেনে নিয়ম মাফিক ছাড়তে ভুলে একচোট সে কাশে। বড়োবিবিকে শুধোয় কাশি সামলে, কোন মুরগি ?

ছোটো মোরগটা।

কলকের আগুনে ফুলবানুর গোবর-মেশানো রাঙামাটি লেপা ঘরের ভিতের মতো মসৃণ চামড়ায় ছেঁকা দিয়ে ফোসকা পেড়ে প্রায় ফেলেছিল এন্তেআলি, পেটের মধ্যে উদ্ভূত একটা খিদের আগুন চাড়া দিয়ে ওঠায় দাঁতে দাঁত কড়মড় করে ক্ষান্ত হয়। মুরগির ! মুরগির ঝোল আর ভাত ! বাড়ি ফিরতে ফিরতে তেপান্তরের মাথাভাঙা সারা মাঠটা সে হিসাব করতে করতে এসেছিল, বড়ো মোরগটা বেচে দেবে পাঁচসিকে দেড়টাকায়। তাছাড়া আর দিন চলার, একটা দিনও চলার উপায় নেই। সদর বাজারে ওটার দাম ন-সিকে আড়াইটাকা, গগনবাবু নিত্য ওর চেয়ে বেশি দরে সায়েব পাড়ায়, ইস্টিশনের সাহেবি খানাপিনার হোটেলে, বাজারের ধারে মাগিপাড়ায় কত মুরগি বেচেছে। হাতিয়াদলে রাজবাড়ি আছে, ইস্কুল আছে, থানা আছে, চাখানা, রেস্তুরখানা আছে, সবই রাজবাড়ির কাছে পাকা রাস্তায়। পুলিশের লোকের তাঁবু পড়েছে রাজবাড়ির দিঘির পাশে মাঠ জুড়ে। ওখানে হয়তো বা বড়ো মোরগটার দাম সাতসিকে দুটাকা মিলে যেতে পারে !

তবে সে সাহস না করাই উচিত হবে। হয়তো কেড়েই নেবে চুরি করা মুরগি বলে, তার চেয়ে—

বড়ো মোরগটা গেলে, ছোটো মোরগ আর দুটো মুরগি থাকবে। ছোটো মোরগটা থেকে মুরগি দুটো আর ডিম পাড়বে কিনা জানা নেই।

এত জটিল হিসাব ছিল এন্তেআলির। গাঁটে একটা আধলা নেই, সদর ইস্টিশনে মাল বয়ে আর রেলগাড়ির সিঁড়িতে বসে ভোলাঘাট ইস্টিশন তক পাঁচ-দশসের চোরা চাল পৌঁছে দিয়ে কিছু রোজগারের ফিকিরে কাল সদরে গিয়েছিল। সাধু সেখের পাল্লায় পড়ে আজকেই গাঁয়ে ফিরতে হল।

মুরগি আন, ভাত আন, হারামজাদিরা !

একা মাংস ভাত সাবাড় করে না, দুই বিবির সাথে বসেই মুরগির ঝোল আর ভাত ভাগাভাগি করে খায় এন্তেআলি। ভাঙা ফতুর কুঁড়েতে যেন ভোজবাজি ! বড়োবিবির দিকে আড় চোখে চেয়ে চোখ টিপে সে মুরগির একটা ঠ্যাং ফুলবানুর ভাঙা তোবড়ানো অ্যালুমিনিয়ামের থালায় তুলে দেয়।

মরণ মোর ! ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে। মুরগি মারার জন্য যে এ গঞ্জনা সে তা বোঝে।

ফুলবানু মুষড়ে গেছে। খেয়ে উঠে তামুক না পেয়ে মুষড়ে যায় এন্তেআলি। আবার সে তাই গঞ্জনা দেয়, একটুক তামুক আনতে নারে, মুরগি কেটে খায় !

পেরানটা কেমন করে বাপটার লেগে বোঝ না তুমি ? বলে হাউহাউ করে কাঁদতে শুরু করে ফুলবানু।

বড়োবিবি ধোয়ামোছা করছিল, কয়েক লহমা ঠায় দাঁড়িয়ে কাঁদন শুনল, তারপর এগিয়ে গিয়ে ঠাস করে চড় বসিয়ে দিল ফুলবানুর গালে। মা যেমন মেয়েকে মারে।

এস্তেআলি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সায় দেয়, মেয়ের ভালোর জন্য মা তাকে শাসন করলে স্নেহশীল বাপ যেমন সমর্থন করে কাজটা। বলে, একটুকু তামুক খাওয়াতে পারিস কাল্লুর মা ? পাবিস যদি তো তোতে মোতে আজ বড়ো খাতির !

দিই তামুক, দিই !

তাড়াতাড়ি ফোঁস করে ওঠে ফুলবানু বড়োবিবি কিছু বলার সুযোগ পাবার আগেই। বলে সে বাপের বাড়ি থেকে তামাক চেয়ে আনতে বেরিয়ে যায়। কাছাকাছিই বাড়ি সাধু সেখের। তবু সাঁঝের পর কমবয়সি পোয়াতি বউয়ের পক্ষে সেটাও বেশ কিছু দূর বইকী !

হারামজাদির সাথে পারি না। এস্তেআলি বলে।

বড়োবিবি কিছু বলে না। এস্তেআলির কথাটা সে ভাবছিল, মানুষটা সত্যই কি তার সাথে শোবে আজ রাতে ? বড়োবিবির বয়স গড়িয়ে যায়নি, মনে মেয়েমানুষের সাধ-আহ্লাদ আছে, ফুলবানু আসার পর এটা একরকম ভুলেই গেছে এস্তেআলি।

সেই যে যায় ফুলবানু আর তার দেখা নাই।

হারামজাদির সাথে পারি না।—এস্তেআলি আবার বলে উঠে লাঠিটা বাগায় বেরোবার জন্য। বহুদিন পরে মাংস ভাত খেয়ে তার ঘুম আসছিল। যদিও টানাটানির ভাত কটা ভাগাভাগি করে খেয়ে মোটেই পেট ভরেনি।

সাধু সেখের বাড়িতে ভিড় জমেছে।

সাধু বলে, বেটি বলল, খবর দি, ডেকে আনি ? মোর মজা লাগল গরজ দেখে। বোস না তুই, বসে থাক চুপ মেরে। এস্তেআলি হাজির হবে ঠিক।

সবার মুখে হাসি ফুটে মিলিয়ে যায়।

গজেন বলে, মেয়ার নালিশের কথাটা বলো ? তোমার তরে মুরগি রাঁধলে, সাত তাড়াতাড়ি মেরে দিয়ে বসে আছে। সে কথাটা বলো !

এ তামাশা নয়, যদিও বলা হয়েছে তামাশা করার সুরে। এ স্রেফ খোঁচা দেওয়া, নিন্দা করা। হারু যে গলা খাঁকরি দেয় সেটাও আসলে গজেনের খোঁচায় সায় দেওয়া।

তোরাফের পিসি মুখ ফুটে স্পষ্ট করে বলেই বসে, নোলা বটে বাবা !

অপমানের গরমে গোমড়া হয়ে উঠেছে এস্তেআলির মুখ। সে ঝেঁঝে বলে, রাত হয়ে গেল তুমি এলে নাকো, খাব না তো করব কী ? বাঁধা জিনিসটা ফেলে দেব ?

ধপ করে সে বসে। আবার বলে, যত শালার ঝকমারি। আর মুরগি নাই ? কাল বেঁধে খাওয়াতে মানা কার ? কাঁদাকাটা নালিশ বজ্জাতি, হাঃ !

চাল কুথা পাব কাল ? আড়াল থেকে ফুলবানু শোনায়, চাচা কাল রইবেনি।

রইবেনি ? এস্তেআলি অবাক হয়ে শুধায় সাধু সেখকে।

সবার এত বদমেজাজের, সাধু সেখের জন্য রাঁধা ভাতমাংস খেয়ে ফেলার খুঁতটা এত বড়ো করে ধরার কারণটা তখন সে টের পায়। ছেড়ে দেবার দু ঘণ্টা পরে শ্রীপতি আর মহীনকে ফের ধরেছে নতুন ওয়ারেন্টে। সাধুকেও ধরত, সে চালাক মানুষ, ব্যাপার আঁচ করে আগেই কেটে পড়েছে।

পেরানটা চাইল না বাবা আর আটক রইতে। কিছুকাল ফেরার থাকি, গা ঢাকা দিয়ে। ও সরকারি শ্বশুরঘরে মোটে মন বসে না। দাড়ির ফাঁকে সাধু সেখ হাসে, ইংরেজ ভেগে গেছে কবে, আইনকানুন পালটে যাবে সব, আজ না তো কাল। না যাবে না ? জমিদার জোতদার রইবে না, দারোগা পুলিশ মোদের পিটতে এসবে না ওদের হয়ে। দেশের মানুষ রাজা হয়েছে, চাষিপেরজা মোদের কথা মানবে তো বটে, আজ না তো কাল ? না মানবে না ? তাই মন করলাম কটা দিন ডুব মেরে কাটিয়ে দিলে আর ভয়টা কী !

শ্রীপতির ভাই ভূপতি বলে, ওরা সরে পড়তে পারল না ?

ছেড়ে দিয়ে আবার ওদের ধরার বিবরণ দেয় সাধু। জেলের দরজাতেই ফের নাকি ধরত তাদের, পরোয়ানা এসে পৌঁছতে দু ঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল। এদিকে তাদের ঘরে বসিয়ে রেখে সবাই ছুটোছুটি করছে তাড়াতাড়ি শোভাযাত্রা বার করে দিতে, তারা তিনজনে বসে ফুঁকছে বিড়ি। আল্লার কী মর্জি, বিড়ি ফুঁকতে সুখ পেল না, তাদের ইচ্ছে হল তামুক খাবে। একবাবু পয়সা দিল আর সাধু গেল দোকান থেকে তামুক আনতে। বাবুদের ঘরের মিঠে তামুক তো মুখে রুচবে না। দোকান আর কদ্দূর, এই সাধুর বাড়ি থেকে শিবমন্দির যতটা ততটা হয় কী না হয়, যেতে আসতে কতটুকু বা সময়। তারই মধ্যে ঝপ করে পুলিশ এসে ঝপ করে ফের ওদের দুজনকে ধরে ফেলল। দূর থেকে লালপাগড়ি দেখে—

পেরানটা খানিক যে কী ওলট-পালট করল কী বলি তুমাদের। ভাবলাম কী যে দুত্তোরি মোর মন্দ মতি, একলাটি পেলিয়ে যাব, একসাথে হাজত থেকে বেরুলাম তিনজনায় ? যেচে যাই, ধরা পড়ি, একসাথে ফের হাজত যাব। তা মোদের ওই নকুল মাইতি, ইস্কুলে পড়ছে ফাস্টো কেলাশে, ঘরে একটি পাশে সে মস্ত মস্ত হবফে লিখতে ছিল শোভাযাত্রার নুটিশ। দু পা এগিয়েছি ধরা দেব বলে, দেখি কি নকুল এসছে এদিক উদিক চাইতে চাইতে। সেই মোকে ভাগিয়ে দিলে। বললে, ডুব মেরে থাকবে যাও, সবার সাথে উপোস করবে যাও, অত জেলের ভাত খায় না !

পেরানটা, ভূপতি বলে, জানো সাধু পুড়তিছে ভাইটার লেগে। নিরেট কথা বলি, মন করে কী, জেলের ভাত খাক। ঘরে ফিরে ভাত পাবে না, জেলের ভাত খাক। জানো সাধু, ওর বউটা মরেছে ম্যালেরিয়া জ্বরে। খপরটা চেপে গেছি।

ভূপতির চেহারাটাই জ্বর আর উপোসের চরম প্রমাণ। অত প্রবল না হোক প্রমাণের ছাপটা আছে সবার চেহারাতেই। কেউ তাই কথা কয় না !

লোক বেড়েই চলে সাধু সেখের দাওয়ায়। দেখা যায় এ গাঁয়ের লোক শুধু নয়, আশেপাশের গাঁ থেকেও লোক আসছে। পুরুষ চাষি নয় সবাই। অনেক মেয়েলোক, নানা বয়সের।

এসো মোরা দিঘির পাড়ে বসি।

অশোক রাজার আমলের দিঘি শুকিয়ে বুজে পুকুর হয়ে গেছে। তারও পাড়ে দূর্বাঘাসের আসন। শীতের রাত্রে নিরুপায় হয়ে তারা সেইখানে গিয়ে বসে। কী ঘন আঁধার রাত, কী ঘন কুয়াশা। তার মধ্যে রাজবাড়ির ফানুস আকাশপ্রদীপ ঝাপসা দেখা যায়।

সাধু সেখ বলে, ওই ফানুসটা ভেঙে চুরে দিয়ে আসতে পার তোমরা কেউ ? ও দেখলে বিগড়ে যায় পেরানটা।

দিঘি

সন্ধ্যার কুয়াশা নামছে।

ছাড়া ছাড়া কুয়াশা আলতো ভাবে দিঘির জল ছুঁয়ে থাকে। আস্তে আস্তে পাক দিয়ে ওঠে, নড়ে চড়ে বেড়ায়, বাতাসে ভেসে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে জল মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এপাড়ে জমিদারের গোয়াল থেকে গাঢ় ঘুঁটের ধোঁয়া মন্থর গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, অদূরে গাঁয়ের চেহারা সন্ধ্যার ছায়া, কুয়াশা আর ঘুঁটের ধোঁয়ায় আবছা হয়ে এসেছে।

দিঘল লম্বাটে দিঘি, চওড়া যে নেহাত কম এমনি তা নয়, লম্বার তুলনায় কম। দক্ষিণের পাড় বাঁধের মতো উঁচু, ওদিকে খুঁড়ে যেতে যেতে নাকি এক সারিতে তফাতে তফাতে তিনটি দেবমূর্তিতে ঠেকে কোদালে বাধা পড়েছিল। সেই লাইনে সীমা হয়েছিল দক্ষিণ তীরের। বিশালতর চৌকোনা না হয়ে দিঘি তাই এ রকম লম্বাটে হয়ে আছে। পাঁচপুরুষ আগে খোঁড়া দিঘি। জলজ উদ্ভিদে ভরে গেছে দিঘির বুক জলের নীচে, সকালে বেলা বেড়ে আর বিকালে বেলা পড়ে এসে সূর্যের আলো যখন খানিক ত্যারচা ভাবে পড়ে, টলটলে স্বচ্ছ জলের নীচে যেন এক অদ্ভুত গাঢ় সবুজ রহস্যপুরীর আবরণ খুলে যায়। উত্তর বা দক্ষিণ তীরে দাঁড়ালে এটা হয়। পুব পশ্চিম তীরে দাঁড়ালে ঝলমলে আলোয় চোখে শুধু ধাঁধা লাগে।

তিন তীরে ঘাট, দক্ষিণ ছাড়া। প্রকাণ্ড বাঁধানো ঘাট, চওড়া সিঁড়ি। আজ ভেঙেচুরে গেছে, বড়ো বড়ো ফাটল ধরেছে, ইট খসে পড়েছে। তবু অনেকের শোয়াবসার মতো অটুট সমতল ঠাঁই আজও মিলবে অনেক ঘাটের চত্বরে।

হাসিতুল্লা চুপ করে বসে থাকে ঘাটে। শূন্য নির্জন চারিদিক, নির্জনতাই যেন ঘন হয়েছে ছায়া আর কুয়াশার রূপে। অজু করে গামছা বিছিয়ে নামাজ পড়েছিল হাসিতুল্লা, তারপর থেকে বসে আছে। অল্প বেলা থাকতে যখন সে পৌঁছেছিল এখানে তখনও জনমানুষহীন ছিল ঘাট, দিঘির আশে পাশে মানুষ চোখে পড়েনি। শিং ভাঙা বুড়ো একটা গোরু শুধু চরছিল দক্ষিণের উঁচু বাঁধে। গাঁয়ের দিকে দু-চারজন মানুষকে দেখা গিয়েছিল এদিক ওদিক চলাফেরা করতে, তারাও যেন লুকোচুরি খেলছিল আপন মনে, এ ঘরের আড়াল থেকে বেরিয়ে খানিক দৃশ্যমান থেকে আড়াল হয়ে যাচ্ছিল গাছপালা ঝোপঝাড় বা অন্য বাড়ির পিছনে। দিঘির পানে কেউ এগিয়ে আসেনি। নারী পুরুষ ছেলে মেয়ে একজনও নয়!

বেশি তফাত নয় গাঁয়ের এদিককার ঘর ক-খানা। মুখহাত ধুতে জল নিতেও আসেনি মেয়েপুরুষ একজন। দিঘির জল কি খারাপ হয়ে গেছে? বিষাক্ত বলে বর্জন করেছে সকলে? কী স্পর্ধা!

দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছে হাসিতুল্লা, অনেক দূরের গাঁ থেকে। জমিদার ডাক দিয়েছে, জরুরি হুকুম, আজের মধ্যে এসে পৌঁছানো চাই যেমন করে হোক, কোনো অজুহাত চলবে না! এমনি আহ্বানের জন্য বাপের আমল থেকে প্রস্তুত হয়েই থাকে হাসিতুল্লারা। আরও আগে দিনে দিনে পৌঁছতে পারত হাসিতুল্লা, রওনা দিতে দেরি হয়ে গেল বিবির জন্য। তার বিবির জ্বর খুব বেড়েছে।

জোরে জোরে একটানা হেঁটেছে বিশ্রামের জন্য না দাঁড়িয়ে, বসে থাকতে আরাম লাগছে বেশ। খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়েছে চারিদিকের অদ্ভুত স্তব্ধতা আর নির্জনতায়। যতবার সে এসেছে এ গাঁয়ে, সকালে বিকালে যখন তাকিয়েছে দিঘির দিকে, আশেপাশে মানুষ দেখে এসেছে চিরদিন, শুনে এসেছে মানুষের গলার আওয়াজ। গাঁয়ের লোক দিঘির জলে স্নান করে, ঘাটে বসে জটলা পাকায়,

দিঘি ঘেঁষে চলাচল কবে, পাশেব মাঠে গোবু বাঁধে ছেলে ছোকবাবা, খেলাধুলো হইচই কবে। সুদীর্ঘ দিঘিটি ও পাড়েব জমিদাব বাড়িকে তফাত কবে বাখে গাঁয়েব জীবন থেকে। গাঁয়েব জীবন দিঘিব এ তীব পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হতে জমিদাব কখনও বাবণ কবেনি।

কী ব্যাপাব তবে ? একটা লোক নেই আশেপাশে যে তাকে ব্যাপাব জিজ্ঞাসা কবে হাসিতুল্লা।

জমিদাব বাড়িও কেমন যেন নিঝুম, আঁধাব আঁধাব। দু-একটা আলো জ্বলেছে, গোয়াল থেকে ঘুঁটেব ধোঁয়া উঠছে, কোনো সাড়াশব্দ নেই। উঠি উঠি কবেও হাসিতুল্লা বসে থাকে। কান খাড়া কবে বাখে পূজাব বাজনাব আওয়াজেব জন্য। পুঁটলিটা পাশে পড়ে আছে, পাকা বাঁশেব মোটা লাঠিটা সে শক্ত কবে ধবে থাকে। লাঠি ধবা মুঠিব মতো কঠিন তাব মুখ। দু-পুবুষ তাদেব লাঠিব মালিক জমিদাব, জমিদাবেব মান বাখাব জন্য এই লাঠি।

অনেক দেবিতে পূজাব বাজনা বাজে জমিদাবেব গৃহমন্দিবে। বাজনায় যেন তেমন জোব নেই, জমকালো আওয়াজ নেই। মনটা হঠাৎ খাবাপ হয়ে যায় হাসিতুল্লাব।

যখন সে ওঠে তখন বাত্রি হয়ে গেছে। কুয়াশাব জন্য আজ ঠান্ডা কম। ঠান্ডাকে ডবায় না হাসিতুল্লা, মাঘেব ঠান্ডাকেও নয়, এ তো অঘ্রানেব হিম। জগতে কাউকে ডবায় না হাসিতুল্লা, কিছুকে ডবায় না তাব লাঠিখানা হাতে থাকতে। তবে কিনা সন্ধ্যাবেলা জনহীন দিঘিব ঘাটে গা ছমছম কবে সেই সবকিছুব [illegible] যা জগৎ ছাড়া, তাব জানা চেনা মাটিব পৃথিবীব যা নয়।

অমনি একটা কিছুব মতোই ছায়াটা কাছে আসে।

একটু শিউবে ওঠে দেহটা হাসিতুল্লাব। কবাব সে তাড়াতাড়ি পলক ফেলে চোখেব।

ছালাম।

মানুষেব গলায় আওয়াজ। হাসিতুল্লা স্বস্তি বোধ কবতে থাকে।

কন থে আইলা মিয়া ? আবে, হাসিতুল্লা নাকি !

চিনবাব নাবলাম তুমাবে।

বোজেনালিবে চিন ?

অ তুমি বোজেনালিব চাচা। চিনছি। ইস্টিমাবে তুমি পিটাইছিলা ফিবিঙ্গিটাবে, হাজত গেছিলা। ছাড়া পাইলা কবে ?

বও মিয়া, হাসাইও না। কোন সালেব কথা কও জাননি ? ছাড়া পাইলাম, নিকা কবলাম, ব্যাটা বেটি পয়দা কবলাম দু-গা, তুমি আইজ জিগাও ছাড়া পাইলাম কবে। ঘুমাইয়া নি ছিলা দুই-দশসাল ?

আবও তিনটে ছায়া এসে যোগ দেয় বোজেনালিব চাচাব সঙ্গে। এবাব অন্য ভয় জাগে হাসিতুল্লাব, কে জানে কী মতলব এদেব। লাঠিটা সে শক্ত কবে ধবে।

পথ ছাড়। পথ ছাইড়া দাও।

পথ ছাড়াই আছে।—নবাগত একজন বলে।

পথ ঠেকাইছে কেডা ? বোজেনালিব চাচা বলে ভোঁতা সুবে, মন চায় যাওগা, ঠেকামু ক্যান ? জিগাইলাম কী, আইছ ক্যান ? না আইলে ভালো কবতা, বদ কাজে আইছ। ধানেব পাওনা ভাগ মোবা নিমু। মবুম বাঁচুম খোদাবে জানাইয়া থুইছি। কয়ডাবে মাববা তুমি, কয়জনাবে ঠেকাইবা ? মিছা আইছ বাই, বদ কামে আইছ। ফিব্যা যাও, ঘবে ফিব্যা যাও।

আবেকটা ছায়া বলে, খাতিব পাইবা না, মিছা আইছ। কত বন্দুক পুলিশ আনছে, তোমাবে পাত্তা দিব ?

দিঘিব ঘাটে চাবজন কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝখানে একেবাবেই যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল, আচমকা মহাসমাবোহে পূজাব বাজনা বেজে উঠে জমিদাব বাড়িতে ঢোল, কাঁসি, ঘণ্টা।

হাসিতুল্লা যেন বুকে জোব পায় খানিকটা। বলে, নিমকহাবামি কবুম না।

কার নিমক খাইছ তুমি ? কীসেব নিমকহারামি ?

হাসিতুল্লা নীরবে এগিয়ে যেতে চাইলে —তামুক খাইয়া যাও। যা মন চায় কইরো তুমি, তামুক খাইয়া যাও।

পথ ছাড়, পথ ছাইড়া দাও !—চিৎকার করে ওঠে হাসিতুল্লা, বাঁশের লাঠিটা বেকায়দায ঘুরিয়ে দেয় মাথার ওপর দিয়ে, তারপর ছুট দেয় দিঘির উত্তর-পুব কোনায় জমিদারের গোয়ালঘরের দিকে।

এরা খানিক দাঁড়িয়ে থাকে। ধিক্কারজনক একটা আওয়াজ করে নটবর বলে, কই নাই হালার পুত বুঝবো না ? পাগড়ি বাইন্ধা চৌকিদারি কইরা খায় আর একখান লাঠি দিয়া বউরে পিটায়, মস্ত মরদ ! বলতে বলতে তার মাথা বিগড়ে যায়, ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করে, ফালডা দিয়া বিঁধলা না ক্যান হারামজাদারে ? জাতভাই বইলা ? নামাজ করে বইলা ?

একটা লোহার রড, ঘষে ঘষে একটা ডগা ছুঁচালো করে বর্শার মতো মারাত্মক অস্ত্র কবা হয়েছে, সেটা ছিল দরগা সেখের হেফাজতে। এ খোঁচা সয় না দরগা সেখেব, হাতের ওই অস্ত্রটা দিয়েই সে ঘায়েল করতে যায় নটবরকে। রোজেনালির চাচা বাঁ হাতে বাগিয়ে নেয় ডান্ডাটা, ডান হাতে একটা চড় কষিয়ে দেয় দরগা সেখের গালে।

বলে, ইয়ের পুত, তোরে কইছিলাম কী ?

দরগা চুপ করে থাকে। তার বয়স মোটে বাইশ তেইশ।

কইছিলাম না বউয়ের বুকে সেক দিবি মালসায় আগুন জ্বাইলা কামের কামে মন নাই, বিবাদ করে। তোমারে কই নটু বাই, যা তা কও ক্যান ? জাতবাই ! লাঠি দিয়া মাথা ভাঙবো, জাতবাই !

খানিক চুপ করে থেকে বলে, আল্লা !

লেঠেল যত জমা হয়েছে কাছারি বাড়ির পিছন দিকে পুরানো মণ্ডপ-চত্বরে তার বহব দেখে বিশেষ আশ্চর্য হয় না হাসিতুল্লা। ব্যাপার সে খানিক আন্দাজ করেছিল দিঘির ঘাটেই। কে না আন্দাজ কবতে পারে আজকের দিনে। চারিদিকে অনেক ঘটনা ঘটছে। একবকম ঘটনা।

এখানে আসর বসে যাত্রাগান কবি কীর্তনের, মস্ত চৌকো পাকা ভিত, গোল গোল মোটা থাম, নিচু ছাদ, চারিদিক খোলা। বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে চারিদিক তাদের থাকার জন্য। ইস্টিমাবের ডেকের মতো কাঁথা-কানির বিছানা পড়েছে সারা মেঝে জুড়ে। একবাতের হানাদাবি লাঠিবাজিব ব্যাপার নয়। চারিদিকে কাছে দূবে গাঁয়ে গাঁয়ে বজ্জাতি জুড়েছে চাষি-প্রজারা, ব্যাপাব সোজাও নয়, সহজে মিটবারও নয়।

লণ্ঠনের আলোয় চেনা চেনা মুখ খোঁজে হাসিতুল্লার চোখ, তার রক্তে সাড়া লেগেছে স্বধর্মী এতগুলি মানুষের কথাবার্তাব গুঞ্জনে, এরা ছাড়া কে বুঝবে লাঠি খেলতে জানা লাঠিয়ালদের, লড়ায়ে সৈন্যদের প্রাণের আত্মীয়তা।

তারপর কয়েকটা চেনা মুখ, কয়েকজন জানা মানুষ মেলে কিন্তু একটু দমিয়ে দেয় হাসিতুল্লার প্রথম উৎসাহ। এরা কেন তাদের দলে ? এরা তো লড়ায়ে লেঠেল নয় ! পিছন থেকে একলা মানুষের মাথায় লাঠি মেরে কাদের ফেরার হয়ে আছে, সোণা জেল খেটেছে চুরির দায়ে। খুন জখম চুরি ডাকাতি মেয়ে লুটের লেঠেল এরা, এরা তো লড়ায়ে লেঠেল নয় ! ব্যগ্র হয়ে হাসিতুল্লা অন্য চেনা মুখ খোঁজে, অন্য জানা মানুষের সন্ধান করে। যারা তার নিজের জাতের লেঠেল, মনিব হুকুম দিলে মরবে জেনেও একা পঞ্চাশ জনের মহড়া নেয়, কিন্তু দুর্বল অসহায়ের উপর, আঁধার রাতে চুপিচুপি পিছন থেকে শত্রুকে মারার হুকুম মনিব দিলেও সে হুকুম অমান্য করে।

নাজু ওস্তাদেরে দেহি না ?

আসে নাই।

বড়ো আলি ?

তেনাও আসে নাই।

লালপুরের গোপেন ?

আইছিল, চুপে চুপে ভাগছে। ডরাইছে বুঝি ব্যাপার দেইখা।

মনে মনে বলে হাসিতুন্না ডরাইছে। লালপুরের গোপেন ডরাইছে, তুমি মস্ত বীরপুরুষ।

মুখ গোমড়া করে বসে থাকে হাসিতুন্না। যে জমায়েতকে গোড়ায় আপন মনে হয়েছিল, ঘনিষ্ঠ হয়ে আর তাদের আত্মীয় ভাবতে পারছে না। সকলের যে সমবেত গুঞ্জন উল্লসিত করেছিল, কী কথা আর কেমন হাসিঠাট্টা দিয়ে তা তৈরি জেনে মনটা বিগড়ে গেছে। কাল এরা পুলিশ দলের সাথে হানা দিয়েছিল কোদপুর গাঁয়ে। একটা মোটে মেয়ে ছিল গাঁয়ে, একটু হাবাটে পাগলা মতো, তবে কচি বয়েস, খাপসুরত চেহারা। হাসিতুন্নার কানের কাছে কজন বলাবলি করে মেয়েটাকে নিয়ে অন্যের মজা করার গল্প, তারা ভাগ পায়নি। শূন্য গাঁয়ে হঠাৎ কোথা থেকে এসে মেয়েটা ছেনুদ্দীন মণ্ডলের ঘরের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে কী রকম হাবার মতো তাকিয়ে ছিল, কে প্রথম টেনে নিয়ে গিয়েছিল শেষে কে ঘর থেকে বেরিয়ে কী রকম ভঙ্গিতে আপশোশ করে বলেছিল, মরে গেছে।

দাড়িতে হাত বুলায় হাসিতুন্না, মাথাটা এদিক ফেরায় ওদিক ফেরায়, যেন ফাঁদে পড়েছে। এদের সে জানে। ভালো করে জানে। মগজে এদের শয়তানের বাসা, শত্রুর ভয়ে আঁধারে লুকিয়ে থাকে, খুঁজে বেড়ায় একা অসহায় মেয়েছেলে, এমনি করে কষ্ট দিয়ে মেরে সুখ পায়। বাইরে যদি পরের মেয়ে না মেলে, নিজের বাড়িতে উলঙ্গ করে খুঁটিতে বেঁধে মারে বাড়ির মেয়ে বউকে।

কর্তা পরা গগন আসে ক্রুদ্ধমূর্তিতে, ধমকে বলে ফের হল্লা শুরু করছ ? আস্তে আস্তে কথা কও কইলাম।

গোমস্তার চোখরাঙানিতে চুপ মেরে যায় এতগুলি মরদ লাঠিয়াল। হাসিতুন্নার প্রাণটা জ্বালা করে।

এ কাদের সাথে ভিড়ছে সে। চাপা গলায় কথা শুরু হয় গগন চলে যেতেই। গগনের বিরুদ্ধেই নালিশের কথা। তার ধমকানির বিরুদ্ধে নয় তাদের পাওনা টাকায় সে যে মোটা ভাগ বসায় তাদের খাওয়া দাওয়া পান তামুকের বরাদ্দে ভাগ বসায়, তারই বিরুদ্ধে।

কত্তারে কও না গিয়া ? না তো নায়েব বাবুরে ? হাসিতুন্না বলে তাদের।

তুমি কও না গিয়া ? কানমলা খাইয়া আসবা।

হাসিতুন্না এদিক ওদিক খোঁজে গগনকে, কর্তাবাবু নয় তো নায়েববাবুকে সে সেলাম জানাবে। দু পুরুষ এ সেলাম জানাবার সম্মান তারা ভোগ করে এসেছে। গতবার যখন সিথুয়ার চর বিবাদে পুলিশের সাথে লড়তে এসেছিল সে আর বড়ো আলি, গোপেনরা, জমিদারবাড়ি রেশি রাতে পৌঁছেও তাকে খবর পাঠাতে হয়নি, কর্তাবাবু নিজে নেমে এসে সেলাম নিয়েছিল, বলেছিল, আইছ হাসিতুন্না ? ওই হালারা চরে পুলিশ আনছে, হাত করছে পুলিশেরে, আমার মান রাখনের ভার তোমার।

আজ গগন তাকে দেখেও দেখল না।

জমিদারবাড়ির অদূরে কলাবাগানের পাশে পুলিশের তাঁবু পড়েছে। এগারো বিঘা জমি নিয়ে জমিদারের নাম করা কলাবাগান, বাবুর খোঁড়া ছোটো ছেলেটার শখের বাগান, কত রকম কলা যে কাঁদির পর কাঁদি ফলে যায়। গাঁয়ের মানুষ দেখতে পাবে চেয়ে চেয়ে, কোনোদিন চাখতে পাবে না, পূজাপার্বণে প্রসাদ বিতরণের সময় যদি দু-একটুকরা জুটে যায়।

বৈঠকখানায় দারোগা, কয়েকজন জোতদার, ছোটো জমিদার নিয়ে কর্তার বৈঠক। কর্তার হাতে গড়গড়ার নল, দারোগাবাবুর মুখে সিগারেট। কাচের গেলাসে রঙিন পানীয়। পর্দা ঠেলে থমকে দাঁড়ায় হাসিতুল্লা।

কে রে তুই !

সেলাম কর্তা। ডাক দিছেন, আইছি।

আরে ব্যাটা হারামজাদা—

দারোগাবাবুর হুংকার থামিয়ে কর্তা বলে, হাসিতুল্লা, গগনের কাছে যাও ! এখানে কী ?

একজন পুলিশ তাকে হাত ধরে টেনে নামিয়ে দেয় বারান্দার নীচে।

এদিক ওদিক চেয়ে কাছারিবাড়ির নির্জনতম দিকে গিয়ে একা একটু বসতে চায় হাসিতুল্লা। বুদ্ধঘরের ভিতরে সে চাপা কান্না শোনে মেয়েছেলের।

রাত্রির গাঢ় কুয়াশার দিকে চেয়ে হাসিতুল্লা বলে, আল্লা।

হারাণের নাতজামাই

মাঝরাতে পুলিশ গাঁয়ে হানা দিল। সঙ্গে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই ও শ্রীপতি। কয়েকজন লেঠেল।

কনকনে শীতের রাত। বিরাম বিশ্রাম ছেঁটে ফেলে উর্ধ্বশ্বাসে তিনটি দিনরাত্রি একটানা ধান কাটার পরিশ্রমে পুরুষেরা অচেতন হয়ে ঘুমোচ্ছিল। পালা করে জেগে ঘরে ঘরে ঘাঁটি আগলে পাহারা দিচ্ছিল মেয়েরা। শাঁখ আর উলুধ্বনিতে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল গ্রামের কাছাকাছি পুলিশের আকস্মিক আবির্ভাবের। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ সমস্ত গাঁ ঘিরে ফেলবার আয়োজন করলে হারাণের ঘর থেকে ভুবন মণ্ডল সরে পড়তে পারত, উধাও হয়ে যেত। গাঁ-সুদ্ধ লোক যাকে আড়াল করে রাখতে চায়, হঠাৎ হানা দিয়েও পুলিশ সহজে তার পাত্তা পায় না। দেড়মাস চেষ্টা করে পারেনি, ভুবন এ গাঁ ও গাঁ করে বেড়াচ্ছে যখন খুশি।

কিন্তু গ্রাম ঘেরবার, আঁটঘাঁট বেঁধে বসবার কোনো চেষ্টাই পুলিশ আজ করল না। সটান গিয়ে গিরে ফেলল দ্বোটো হাঁসতলা পাড়াটুকুর কখানা ঘর যার মধ্যে একটি ঘর হারাণের। বোঝা গেল আঁটঘাঁট আগে থেকে বাঁধাই ছিল।

ভেতরের খবর পেয়ে এসেছে।

খবর পেয়ে এসেছে মানেই খবর দিয়েছে কেউ। আজ বিকালে ভুবন পা দিয়েছে গ্রামে, হঠাৎ সন্ধ্যার পরে তাকে অতিথি করে ঘরে নিয়ে গেছে হারাণের মেয়ে ময়নার মা, তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল না কোন পাড়ায় কার ঘরে সে থাকবে। খবর তবে গেছে ভুবন হারাণের ঘরে যাবার পরে ! এমনও কি কেউ আছে তাদের এ গাঁয়ে ? শীতের তে-ভাগা চাঁদের আবছা আলোয় চোখ জ্বলে ওঠে চাষিদের, জানা যাবে সাঁঝের পর কে গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল। জানা যাবেই এ বজ্জাতি গোপন থাকবে না।

দাঁতে দাঁত ঘষে গফুরালী বলে, দেইখা লমু কোন হালা পিঁপড়ার পাখা উঠছে। দেইখা লমু।

ভুবন মণ্ডলকে তারা নিয়ে যেতে দেবে না সালিগঞ্জ গাঁ থেকে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে ভুবন এতদিন গ্রেপ্তারি ওয়ারেন্টকে কলা দেখিয়ে, কোনো গাঁয়ে সে ধরা পড়েনি। সালিগঞ্জ থেকে তাকে পুলিশ নিয়ে যাবে ? তাদের গাঁয়ের এ কলঙ্ক তারা সইবে না। ধান দেবে না বলে কবুল করেছে জান, সে জানটা দেবে এই আপনজনটার জন্যে।

শীতে আর ঘুমে অবশপ্রায় দেহগুলি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। লাঠি সড়কি দা কুড়ুল বাগিয়ে চাষিরা দল বাঁধতে থাকে। সালিগঞ্জে মাঝরাতে আজ দেখা দেয় সাংঘাতিক সম্ভাবনা !

গোটা আষ্টেক মশাল পুলিশ সঙ্গে এনেছিল, তিন চারটে টর্চ হাঁসখালি পাড়া ঘিরতে ঘিরতে দপদপ করে মশালগুলি তারা জ্বেলে নেয়। দেখা যায় সব সশস্ত্র পুলিশ, কানাই ও শ্রীপতির হাতেও দেশি বন্দুক।

পাড়াটা চিনলেও কানাই বা শ্রীপতি হারাণের বাড়িটা ঠিক চিনত না। সামনে রাখালের ঘর পেয়ে ঝাঁপ ভেঙে তাকে বাইরে আনিয়ে রেইডিং পার্টির নায়ক মন্মথকে তাই জিজ্ঞেস করতে হয়, হারাণ দাসের কোন বাড়ি ?

তার পাশের বাড়ির হারাণ ছাড়াও যেন কয়েক গণ্ডা হারাণ আছে গাঁয়ে। বোকার মতো রাখাল পালটা প্রশ্ন করে, আজ্ঞা কোন হারাণ দাসের কথা কন ?

গালে একটা চাপড় খেয়েই এমন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রাখাল, দম আটকে আটকে এমন সে ঘন ঘন উকি তুলতে থাকে যে তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করাই অনর্থক হয়ে যায় তখনকার মতো। বোবা হাবা চাষাগুলো শুধু বেপরোয়া নয় একেবারে তুখোর হয়ে উঠেছে চালাকিবাজিতে।

এদিকে হারাণ বলে, হায় ভগবান।

ময়নার মা বলে, তুমি উঠলা কেন কও দিকি ?

বলে কিন্তু জানে যে তার কথা কানে যায়নি বুড়োর। চোখে যেমন কম দেখে, কানেও তেমনি কম শোনে হারাণ। কী হয়েছে ভালো বুঝতেও বোধ হয় পারেনি, শুধু বাইরে একটা গণ্ডগোল টের পেয়ে ভড়কে গিয়েছে। ছেলে আর মেয়েটাকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে চটপট, এই বুড়োকে বোঝাতে গেলে এত জোরে চেঁচাতে হবে যে প্রত্যেকটি কথা কানে পৌঁছবে বাইরে যারা বেড় দিয়েছে। দু-এক দণ্ড চেঁচালেই যে বুঝবে হারাণ তাও নয়, তার ভোঁতা টিমে মাথায় অত সহজে কোনো কথা ঢোকে না। এই বুড়োর জন্য না ফাঁস হয়ে যায় সব !

ভুবনকে বলে ময়নার মা, বুড়া বাপটার তরে ভাবনা !

ভুবন বলে, মোর কিন্তু হাসি পায় ময়নার মা।

ময়নার মা গম্ভীর মুখে বলে, হাসির কথা না। গুলিও করতে পারে। দেখন মাস্তর। কইবো হাঙ্গামা করছিলেন।

তাড়াতাড়ি একটা কুপি জ্বালে ময়নার মা। হারাণকে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে হাতের আঙুলের ইশারায় তাকে মুখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলে। তারপর কুপির আলোয় মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিদারুণ আপশোশে ফুঁসে ওঠে, আঃ ! ভালো শাড়িখান পবতে পাবলি না ?

বলছ নাকি ? ময়না বলে।

ময়নার মা নিজেই টিনের তোরঙ্গের ডালাটা প্রায় মুচড়ে ভেঙে তাঁতের রঙিন শাড়িখানা বার করে। ময়নার পরনের ছেঁড়া কাপড়খানা তার গা থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এলোমেলো ভাবে জড়িয়ে দেয় রঙিন শাড়িটি।

বলে, ঘোমটা দিবি। লাজ দেখাবি। জামায়ের কাছে যেমন দেখাস। ভুবনকে বলে, ভালো কথা শোনেন, আপনার নাম হইল জগমোহন, বাপের নাম সাতকড়ি। বাড়ি হাতিনাড়া থানা গৌরপুর

নতুন এক কোলাহল কানে আসে ময়নার মার। কান খাড়া করে সে শোনে। কুপির আলোতেও টের পাওয়া যায় প্রৌঢ় বয়সের শুরুতেই তার মুখখানাতে দুঃখ দুর্দশার ছাপ ও রেখা কী রুক্ষতা ও কাঠিন্য এনে দিয়েছে। ধুতি পরা বিধবার বেশ আর কদমছাঁটা চুল চেহারায় এনে দিয়েছে পুরুষালি ভাব।

গাঁ ভাইঙ্গা বুইখা আইতেছে। তাই না ভাবতেছিলাম ব্যাপার কী, গাঁর মাইনষের সাড়া নাই!

ভুবন বলে, তবেই সারছে। দশলিশটা খুনজখম হইব নির্ঘাত। আমি যাই, সামলাই গিয়া।

থামেন আপনে, বসেন, ময়নার মা বল্লে, দ্যাখেন কী হয়।

শ দেড়েক চাষি চাষাড়ে অস্ত্র হাতে এসে দাঁড়িয়েছে দল বেঁধে। ওদের আওয়াজ পেয়ে মন্মথও জড়ো করেছে তার ফৌজ হারাণের ঘরের সামনে—দু-চারজন শুধু পাহারায় আছে বাড়ির পাশে ও পিছনে, বেড়া ডিঙিয়ে ওদিক দিয়ে ভুবন না পালায়। দশটি বন্দুকের জোর মন্মথের, তার নিজের রিভলভার আছে। তবু চাষিদের মরিয়া ভাব দেখে সে অস্বস্তি বোধ করছে স্পষ্টই বোঝা যায়। তার সুরটা

রীতিমতো নরম শোনায়—স্রেফ হুকুমজারির বদলে সে যেন একটু বুঝিয়ে দিতে চায় সকলকে উচিত আর অনুচিত কাজের পার্থক্যটা, পরিণামটাও।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে সে জানায় যে হাকিমের দস্তখতি পরোয়ানা নিয়ে সে এসেছে হারাণের ঘর তল্লাশ করতে। তল্লাশ করে আসামি না পায় ফিরে চলে যাবে। এতে বাধা দেওয়া হাঙ্গামা করা উচিত নয়, তার ফল খারাপ হবে। বেআইনি কাজ হবে সেটা।

গফুর চেঁচিয়ে বলে, মোরা তল্লাশ করতি দিমু না।

প্রায় দুশো গলা সায় দেয়, দিমু না !

এমনই যখন অবস্থা, সংঘর্ষ প্রায় শুরু হয়ে যাবে, মন্মথ হুকুম দিতে যাচ্ছে গুলি চালাবার, ময়নার মার খ্যানখেনে তীক্ষ্ণগলা শীতার্ত থমথমে রাত্রিকে ছিঁড়ে কেটে বেজে উঠল, রও দিকি তোমরা, হাঙ্গামা কইবো না। মোব ঘরে কোনো আসামি নাই। চোর ডাকাইত নাকি যে ঘরে আসামি রাখুম ? বিকালে জামাই আইছে শোয়াইছি মাইয়া জামাইরে। দারোগাবাবু তাল্লাশ করতে চান, তাল্লাশ কবেন।

মন্মথ বলে, ভুবন মণ্ডল আছে তোমার ঘরে।

ময়নার মা বলে, দ্যাখেন আইসা, তাল্লাশ করেন। ভুবন মণ্ডল কেডা ? নাম তো শুনি নাই বাপের কালে। মাইয়ার বিয়া দিলাম বৈশাখে, দুই ভরি রুপা কম দিছি ক্যান, জামাই ফিরা্য তাকায় না। দুই ভরির দাম পাঠাইয়া দিছি তবে আইজ জামাই পায়ের ধুলা দিছে। আপনারে কমু কী দারোগাবাবু, মাইযাটা শইন্দা মবে। মাইয়া যত কান্দে, আমি তত কান্দি—

আচ্ছা, আচ্ছা।— মন্মথ বলে, ভুবনকে না পাই, জামাই নিয়ে তুমি রাত কাটিয়ো।

গৌর সাউ হেঁকে বলে, অত চুপে চুপে আসে কেন জামাই ময়নার মা ?

গা জ্বলে যায় ময়নাব মার। বলে, সদর দিয়া আইছে ! তোমার একটা মাইয়ার সাতটা জামাই চুপে চুপে আসে, মোর জামাই সদর দিয়া আইছে !

গৌব আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কে যেন আঘাত করে তার মুখে। একটা আর্ত শব্দ শুধু শোনা যায়, সাপেধরা ব্যাঙেব একটিমাত্র আওযাজের মতো।

ময়নাব রঙিন শাড়ি ও আলুথালু বেশ চোখে যেন ধাঁধা লাগিযে দেয় মন্মথের, পিচুটির মতো চোখে এঁটে যেতে যায় ঘোমটা পরা ভীরু লাজুক কচি চাষি মেয়েটার আধপুষ্ট দেহটি। এ যেন কবিতা। বি এ পাশ মন্মথের কাছে, যেন চোবাই স্কচ হুইস্কির পেগ, যেন মাটির পৃথিবীর জীর্ণক্লিষ্ট অফিসিয়াল জীবনে একফোঁটা টসটসে দরদ। তার রীতিমতো আপশোশ হয় যে জোয়ান মর্দ মাঝবয়সি চাষাড়ে লোকটা এর স্বামী, ওর আদরেই মেয়েটাব এই আলুথালু বেশ !

তবু মন্মথ জেরা করে, সংশয় মেটাতে গাঁয়েব দুজন বুড়োকে এনে শনাক্ত করায়। তার পরেও যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না ! ভুবন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গায়ে চাদর জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিরীহ গোবেচারি সেজে। কিন্তু খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি ভরা মুখ, রুক্ষ এলোমেলো একমাথা চুল, মোটেই তাকে দেখায় না নতুন জামায়ের মতো। মন্মথ গর্জন করে হারাণকে প্রশ্ন করে, এ তোমার নাতনির বর ?

হারাণ বলে, হায় ভগবান !

ময়নার মা বলে, জিগান মিছা, কানে শোনে না বদ্ধ কালা।

অ ! মন্মথ বলে।

ভুবন ভাবে এবার তার কিছু বলা বা করা উচিত।

এমন হাঙ্গামা জানলে আইতাম না কর্তা। মিছা কইয়া আনছে আমারে। সড়াইলের হাটে আইছি, ঠাইরেন পোলারে দিয়া খপর দিলেন, মাইয়া নাকি মরো মরো তখন যায় এখন যায়।

তুমি অমনি ছুটে এলে ?

আসুম না ? রতিভরি সোনারুপা যা দিব কইছিল, তাও ঠেকায় নাই বিয়াতে। মইরা গেলে গাও থেইকা খুইলা নিলে আর পামু ?

ওঃ ! তাই ছুটে এসেছ ? তুমি হিসেবি লোক বটে। মন্মথ বলে ব্যঙ্গ করে আর কিছু করার নেই, বাড়িগুলি তল্লাশ ও তছনছ করে নিয়ম রক্ষা করা ছাড়া। জামাইটাকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া চলে সন্দেহের যুক্তিতে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু হাঙ্গামা হবে। দু-পা পিছু হটে এখনও চাষির দল দাঁড়িয়ে আছে, ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়নি। গাঁয়ে গাঁয়ে চাষাগুলোর কেমন যেন উগ্র মরিয়া ভাব, ভয় ডর নেই। ঘরে ঘরে তল্লাশ চলতে থাকে। একটা বিড়াল লুকানোর মতো আড়ালও যে ঘরে নেই সে ঘরেও কাঁথাকানি হাঁড়িপাতিল জিনিসপত্র ছত্রখান করে খোঁজা হয় মানুষকে।

মন্মথ থাকে হারাণের বাড়িতেই। অল্প নেশায় রঙিন চোখ। এ সব কাজে বেরোতে হলে মন্মথ অল্প নেশা করে, মাল সঙ্গে থাকে কর্তব্য সমাপ্তির পর টানবার জন্য,—চোখ তার রঙিন শাড়িজড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে চায় না। কুরিয়ে কুরিয়ে তাকায় ময়নার কুড়ি-বাইশবছরের জোয়ান ভাইটা, উশখুশ করে ক্রমাগত। ভুবনেব চোখ জ্বলে ওঠে থেকে থেকে। ময়নার মা টের পায়, একটু যদি বাড়াবাড়ি করে মন্মথ, আর রক্ষা থাকবে না !

মেয়েটাকে বলে ময়নার মা, শীতে কাঁপুনি ধরেছে, শো না গিয়া বাছা ? তুমিও শুইয়া পড় বাবা। আপনে অনুমতি দ্যান দারোগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কত মানত কইরা, মাথা কপাল কুইটা আনছি জামাইরে,—ময়নার মার গলা ধরে যায়, আপনারে কী কমু দারোগাবাবু—

ময়না ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ভুবন যায় না।

আরও দুবার ময়নার মা সস্নেহে সাদর অনুরোধ জানায় তাকে, তবু ভুবনকে ইতস্তত করতে দেখে বিরক্ত হয়ে জোর দিয়ে বলে, গুরুজনের কথা শোনো, শোও গিয়া। খাড়াইয়া কী করবা ? ঝাঁপ বন্ধ কইরা শোও।

তখন তাই করে ভুবন। যতই তাকে জামাই মনে না হোক, এরপর না মেনে কি আর চলে যে সে জামাই ? মন্মথ আস্তে আস্তে বাইরে পা বাড়ায়। পকেট থেকে চ্যাপটা শিশি বার করে ঢেলে দেয় গলায়।

পরদিন মুখে মুখে এ গল্প ছড়িয়ে যায় দিগ্‌দিগন্তে, দুপুরের আগে হাতিপাড়ার জগমোহন আর জোতদার চণ্ডী ঘোষ আর বড়ো থানার বড়ো দারোগার কাছে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়। গাঁয়ে গাঁয়ে লোকে বলাবলি করে ব্যাপারটা আর হাসিতে ফেটে পড়ে, বাহবা দেয় ময়নার মাকে ! এমন তামাশা কেউ কখনও করেনি পুলিশের সঙ্গে, এমন জব্দ করেনি পুলিশকে। কদিন আগে দুপুরবেলা পুরুষশূন্য গাঁয়ে পুলিশ এলে ঝাঁটা বঁটি হাতে মেয়ের দল নিয়ে ময়নার মা তাদের তাড়া করে পার করে দিয়েছিল গাঁয়ের সীমানা ! সে যে এমন রসিকতাও জানে কে তা ভাবতে পেরেছিল ?

গাঁয়ের মেয়েরা আসে দলে দলে, অনিশ্চিত আশঙ্কা ও সম্ভাবনায় ভবা এমন যে ভয়ংকর সময় চলেছে এখন, তার মধ্যেও তারা আজ ভাবনা চিন্তা ভুলে হাসিখুশিতে উচ্ছল।

মোক্ষদার মা বলে একগাল হেসে গালে হাত দিয়ে, মাগো মা ময়নার মা, তোর মদ্যি এত ?

ক্ষেন্তি বলে ময়নাকে, কী লো ময়না, জামাই কী কইলো ? দিছে কী ?

লাজে ময়না হাসে।

বেলা পড়ে এলে, কাল যে সময় ভুবন মণ্ডল গাঁয়ে পা দিয়েছিল প্রায় সেই সময়, আবির্ভাব ঘটে জগমোহনের। বয়স তার ছাব্বিশ সাতাশ, বেঁটেখাটো জোয়ান চেহারা, দাড়ি কামানো, চুল

আঁচড়ানো। গায়ে ঘরকাচা শার্ট, কাঁধে মোটা সুতির সাদা চাদর। গাঁয়ে ঢুকে গটগট করে সে চলতে থাকে হারাণের বাড়ির দিকে, এপাশ ওপাশ না তাকিয়ে, গম্ভীর মুখে।

রসিক ডাকে দাওয়া থেকে, জগমোহন নাকি ? কখন আইলা ?

নন্দ বলে, আরে শোনো, শোনো, তামুক খাইয়া যাও।

জগমোহন ফিরেও তাকায় না।

রসিক ভড়কে গিয়ে নন্দকে শুধোয়, কী কাণ্ড বুঝলা নি ?

কেমনে কমু ?

অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দুজনে।

পথে মথুরের ঘর। তার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা আছে জগমোহনের। নাম ধরে হাঁক দিতে ভেতর থেকে সাড়া আসে না, বাইরের লোক জবাব দেয়। ঘরের কাছেই পথের ওপাশে একটা তালের গুঁড়িতে দুজন মানুষ বসে ছিল নির্লিপ্তভাবে, একজনের হাতে খোঁটা-সুদ্ধ গোরু-বাঁধা দড়ি।

তাদের একজন বলে, বাড়িত নাই। তুমি কেডা, হারামজাদাটারে খোঁজ ক্যান ?

জগমোহন পরিচয় দিতেই দুজনে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

অ ! তুমিও আইছ ব্যাটারে দুই ঘা দিতে ?

তা ভয় নেই জগমোহনের, তারা আশ্বাস দেয়, হাতের সুখ তার ফসকাবে না। কাল সন্ধ্যায় গেছে গাঁ থেকে, এখনও ফেরেনি মথুর, কখন ফিরে আসে ঠিকও নাই, তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না জগমোহনকে! মথুর ফিরলে তাকে যখন বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে বিচারের জন্য, সে খবর পাবে। সবাই মিলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলার আগে তাকেই নয় সুযোগ দেওয়া হবে মথুরের নাক কানটা কেটে নেবার, সে ময়নার মার জামাই, তার দাবি সবার আগে !

শাউড়ি পাইছিলা দাদা একখান !

নিজের হইলে বুঝতা। জগমোহন জবাব দেয় ঝাঁঝের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করে। শুনে দুজনে তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে অবাক হয়ে !

আচমকা জামাই এল, মুখে তার ঘন মেঘ। দেখেই ময়নার মা বিপদ গনে। ব্যস্তসমস্ত না হয়ে হাসিমুখে ধীর শান্তভাবে অভ্যর্থনা জানায়, তার যেন আশা ছিল জানা ছিল এ সময় এমনি ভাবে জামাই আসবে, এটা অঘটন নয়। বলে, আস বাবা আস। ও ময়না, পিঁড়া দে। ভালো নি আছে বেবাকে ? বিয়াই বিয়ান পোলামাইয়া ?

আছে।

আরেকটু ভড়কে যায় ময়নার মা। কত গোসা না জমা আছে জামাইয়ের কাটাছাঁটা এই এক কথার জবাবে। ময়নার দিকে তার না-তাকাবার ভঙ্গিটাও ভালো ঠেকে না। পড়ন্ত রোদে লাউমাচার সাদাফুলের শোভা ছাড়া আর কিছুই যেন চোখ চেয়ে দেখবে না শ্বশুরবাড়ির পণ করেছে জগমোহন ! লক্ষণ খারাপ।

ঘর থেকে কাঁপা কাঁপা গলায় হারাণ হাঁকে, আসে নাই ? হারামজাদা আসে নাই ? হায় ভগবান !

নাতিরে খোঁজে, ময়নার মা জগমোহনকে জানায়, বিয়ান থেইকা দ্যাখে না, উতলা হইছে।

ময়নার মা প্রত্যাশা করে যে নাতিকে হারাণ সকাল থেকে কেন দ্যাখে না, কী হয়েছে হারাণের নাতির, ময়নার ভায়ের, জানতে চাইবে জগমোহন কিন্তু কোনো খবর জানতেই এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না তার।

খাড়াইয়া রইলা ক্যান ? বস বাবা, বস।

জগমোহন বসে। ময়নার পাতা পিঁড়ি সে ছোঁয় না, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উবু হয়ে বসে।

মুখ হাত ধুইয়া নিলে পারতা।

না যামু গিয়া অখনি।

অখনি যাইবা ?

হ। একটা কথা শুইনা আইলাম। মিছা না খাঁটি জিগাইয়া যামু গিয়া। মাইয়া নাকি কার লগে শুইছিল কাইল রাইতে ?

শুইছিল ? ময়নার মার চমক লাগে, মোর লগে শোয় মাইয়া, মোর লগে শুইছিল, আর কার লগে শুইব ?

ব্রহ্মাণ্ডের মাইনষে জানছে কার লগে শুইছিল। চোখে দেইখা গেছে দুয়ারে ঝাঁপ দিয়া কার লগে শুইছিল।

তারপর বেধে যায় শাশুড়ি জামায়ে। প্রথমে ময়নার মা ঠান্ডা মাথায় নরম কথায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে চেষ্টা করে, কিন্তু জগমোহনের ওই এক গোঁ ! ময়নার মাও শেষে গরম হয়ে ওঠে। বলে, তুমি নিজে মন্দ, অন্যেরে তাই মন্দ ভাব। উঠানে মাইনষের গাদা, আমি খাড়া সামনে, এক দণ্ড ঝাঁপটা দিছে কি না দিছে, তুমি দোষ ধরলা ! অন্যে তো কয় না ?

অন্যের কী ? অন্যের বউ হইলে কইতো।

বড়ো ছোটো মন তোমার। আইজ মণ্ডলের নামে এমন কথা কইলা, কাইল কইবা জুয়ান ভায়ের লগে ক্যান কথা কয়।

কওন উচিত। ও মাইয়া সব পারে। তখন আর শুধু গরম কথা নয়, ময়নার মা গলা ছেড়ে উদ্ধার করতে আরম্ভ করে জগমোহনের চোদ্দোপুরুষ। হারাণ কাঁপা গলায় চেঁচায়, আইছে নাকি ? আইছে হারামজাদা ? হায় ভগবান, আইছে ? ময়না কাঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছুটে আসে পাড়াবেড়ানি নিন্দাছড়ানি নিতাই পালের বউ আর প্রতিবেশী কয়েকজন স্ত্রীলোক।

কী হইছে গো ময়নার মা ? নিতাই পালের বউ শুধায়, মাইয়া কাঁদে ক্যান ?

তাদের দেখে সংবিৎ ফিরে পায় ময়নার মা, ফোঁস করে ওঠে, কাঁদে ক্যান ? ভাইটারে ধইরা নিছে, কাঁদব নাই?

জামাই বুঝি আইছে খবর পাইয়া ?

শুনবা বাছা, শুনবা। বইতে দাও জিরাইতে দাও।

ময়নার মার বিরক্তি দেখে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক পদে মেয়েরা ফিরে যায়। তাকে ঘাঁটাবার সাহস কারও নেই। ময়নার মা মেয়েকে ধমক দেয়, কাঁদিস না। বাপেরে নিয়া ঘরে গেছিলি, বেশ করছিলি, কাঁদনের কী ?

বাপ নাকি ? জগমোহন বলে ব্যঙ্গ করে।

বাপ না? মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিত বেবাক ধান। তোমারে কই জগু, হাতে ধইরা কই, বুইঝা দ্যাখো, মিছা গোসা কইরো না।

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই।

রাইতটা থাইকা যাও। জামাই আইলা, গেলা গিয়া, মাইনষে কী কইব ?

জামায়ের অভাব কী। মাইয়া আছে, কত জামাই জুটবো।

বেলা শেষ হতে না হতে ঘনিয়ে এসেছে শীতের সন্ধ্যা। অল্প অল্প কুয়াশা নেমেছে। ঘুঁটের ধোঁয়া ও গন্ধে নিশ্চল বাতাস ভারী। যাই বলেই যে গা তোলে জগমোহন তা নয়। ময়নার মারও তা জানা আছে যে শুধু শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে যাই বলেই জামাই গটগট করে বেরিয়ে যাবে না। ময়নার সাথে বোঝাপড়া, ময়নাকে কাঁদানো, এখনও বাকি আছে। যদি যায় জামাই, মেয়েটাকে নাকের জলে

চোখের জলে এক করিয়ে তারপর যাবে। আর কথা বলে না ময়নার মা, আস্তে উঠে বেরিয়ে যায় বাড়ি থেকে। ঘরে কিছু নেই, মোয়ামুড়ি কিছু জোগাড় করতে হবে। খাক বা না খাক সামনে ধরে দিতেই হবে জামাইয়ের।

চোখ মুছে নাক ঝেড়ে ময়না বলে ভয়ে ভয়ে, ঘরে আস।

খাসা আছি। শুইছিলা তো ?

না, মা কালীর কিরা, শুই নাই। মায় কওনে খালি ঝাঁপটা দিছিলাম, বাঁশটাও লাগাই নাই।

ঝাঁপ দিছিলা, শোও নাই। বেউলা সতী !

ময়না তখন কাঁদে।

তোমার লগে আইজ থেইকা শেষ।

ময়না আরও কাঁদে।

ঘর থেকে হারাণ কাঁপা গলায় হাঁকে, আসে নাই ? ছোঁড়া আসে নাই ? হায় ভগবান !

থেমে থেমে এক একটা কথা বলে যায় জগমোহন, না থেমে অবিরাম কেঁদে চলে ময়না, যতক্ষণ না কান্নাটা একঘেয়ে লাগে জগমোহনের। তখন কিছুক্ষণ সে চুপ করে থাকে। মুড়িমোয়া জোগাড় করে পাড়া ঘুরে ময়নার মা যখন ফিরে আসে, ময়না তখন চাপা সুরে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। বেড়ার বাইরে সুপারিগাছটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ময়নার মা। সারাদিন পরে এখন তার দু চোখ জলে ভরে যায়। জোতদারের সাথে, দারোগা পুলিশের সাথে লড়াই করা চলে, অবুঝ পাষণ্ড জামাইয়ের সাথে লড়াই নেই !

আপন মনে আবাব হাঁকে হারাণ, আসে নাই ? মোর মরণটা আসে নাই ? হায় ভগবান !

জগমোহন চুপ করেছিল, এতক্ষণ পরে হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে শালার খবর।—উয়ারে ধরছে ক্যান ?

ময়নাব কান্না থিতিয়ে এসেছিল, সে বলে, মণ্ডলখুড়ার লগে গোঁদলপাড়া গেছিল, ফিরতি পথে একা পাইয়া ধরছে।

ক্যান ধরছে ?

কাইল জব্দ হইছে, সেই রাগে বুঝি।

বসে বসে কী ভাবে জগমোহন, আর কাঁদায় না ময়নাকে। ময়নার মা ভেতরে আসে, কাঁসিতে মুড়ি আর মোয়া খেতে দেয় জামাইকে, বলে, মাথা খাও, মুখে দাও।

আবার বলে, রাইত কইরা ক্যান যাইবা বাবা ? থাইকা যাও।

থাকনের জো নাই। মা দিব্যি দিছে।

তবে খাইয়া যাও ? আখা ধরাই ? পোলাটারে ধইরে নিছে, পরানডা পোড়ায়। তোমারে রাইখা জুড়ামু ভাবছিলাম।

না, রাইত বাড়ে।

আবার কবে আইবা ?

দেখি।

উঠি উঠি করেও দেরি হয়। তারপর আজ সন্ধ্যাবাতেই পুলিশ হানার সেই রকম শোর ওঠে কাল মাঝরাত্রির মতো। সদলবলে মন্মথ আবার আচমকা হানা দিয়েছে। আজ তার সঙ্গের শক্তি কালের চেয়ে অনেক বেশি। তার চোখ সাদা।

সোজাসুজি প্রথমেই হারাণের বাড়ি।

কী গো মণ্ডলের শাশুড়ি, মন্মথ বলে ময়নার মাকে, জামাই কোথা ?

ময়নার মা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এটা আবার কে ?

জামাই। ময়নার মা বলে।

বাঃ, তোর তো মাগি ভাগ্যি ভালো, রোজ নতুন নতুন জামাই জোটে ! আর তুই ছুঁড়ি এই বয়সে—

হাতটা বাড়িয়েছিল মন্মথ রসিকতার সঙ্গে ময়নার থুতনি ধরে আদর করে একটু নেড়ে দিতে। তাকে পর্যন্ত চমকে দিয়ে জগমোহন লাফিয়ে এসে ময়নাকে আড়াল করে গর্জে ওঠে, মুখ সামলাইয়া কথা কইবেন !

বাড়ির সকলকে, বুড়ো হারাণকে পর্যন্ত, গ্রেপ্তার করে আসামি নিয়ে রওনা দেবার সময় মন্মথ দেখতে পায় কালকের মতো না হলেও লোক মন্দ জমেনি। দলে দলে লোক ছুটে আসছে চারিদিক থেকে, জমায়েত মিনিটে মিনিটে বড়ো হচ্ছে। মথুরের ঘর পার হয়ে পানা-পুকুরটা পর্যন্ত গিয়ে আর এগোনো যায় না। কালের চেয়ে সাত-আটগুণ বেশি লোক পথ আটকায়। রাত বেশি হয়নি, শুধু এ গাঁয়ের নয়, আশপাশের গাঁয়ের লোক ছুটে এসেছে। এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বুঝা যেত, হারাণের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে ! মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

ময়না তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়েই রক্ত মুছিয়ে দিতে আরম্ভ করে জগমোহনের। নব্বই বছরের বুড়ো হারাণ সেইখানে মাটিতে মেয়ের কোলে এলিয়ে নাতির জন্য উতলা হয়ে কাঁপা গলায় বলে, ছোঁড়া গেল কই ? কই গেল ? হায় ভগবান !

ধান

অন্ধকার উৎকর্ণ হয়ে আছে ধানের গোলাটা ঘিরে, মাঝরাত্রির চাঁদ-ডোবা অন্ধকার। সন্তর্পণে পা ফেলে এগিয়ে গাঢ়তর ছায়ায় মিশে যাবার চেষ্টা করছে অর্ধউলঙ্গ মূর্তিটা, শ্বাসরোধ করে দু চোখে অন্ধকার ভেদ করে আবিষ্কারের চেষ্টা করছে প্রহরীর গোপন উপস্থিতি। অত্যন্ত ভয়ে উত্তেজনায় টান টান হয়ে গেছে অর্ধউলঙ্গ দেহটা।

পাহারা নেই ? এ দিনে ধানের গোলা, প্রাণের গুদাম, পাহারাশূন্য ? এটা ধাঁধার মতো লাগে পাঁচুর কাছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে পাহারাদার অন্তরালে আরামের ব্যবস্থা করে, নয় কর্তব্যে ফাঁকি দিয়েছে স্ফূর্তির জন্য কোথাও গিয়ে। মানুষ যখন ধানের জন্য উন্মাদ, গা-ঘেঁষা মরণ ঠেকাতে দিশেহারা, মরিয়া, গোলাভরা ধান তখন অরক্ষিত রেখে দিতে পারে শরৎ হালদার ?

কাঁধের ঝোলা নামিয়ে রাখে পাঁচু, ঝোলা থেকে বার করে চকচকে দা, তারার আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে তার ধার। গোলার যেটা পিছন দিক, দু-তিনহাত তফাতেই এক ইটের দেওয়াল, সেইখানে স্যাঁতসেঁতে শেওলায় জমানো আবর্জনায় দাঁড়িয়ে সিমেন্টের ভিত্তির আধহাত উঁচুতে গোলার মাটি লেপা চাঁচের বেড়া কাটতে শুরু করে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে, আওয়াজ বাঁচিয়ে, ধীরে ধীরে সিঁদ দেয় সঞ্চিত জীবনের ভাণ্ডারে। ছোটোখাটো গর্ত হলেই যথেষ্ট, সেই ফুটো দিয়েই শস্যকণা ঝুরঝুর করে বেরিয়ে আসবে। তার থলি ভরে যাবে। উপোস-জ্বরের শান্তি ঘটিয়ে কাল অন্নপথ্য করবে সে আর বুঁচি।

দেয়াল ভেদ হয়। ধান গড়িয়ে আসে না। ডান হাতটা পাঁচু সবখানি ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ভেতরে, ছড়ে যায় কেটে যায় হাতের চামড়া। গোলার মধ্যে হাতড়ে ধান খোঁজে। দু-চারটে ধান পড়ে আছে মেঝেতে, গোলা ধানশূন্য !

হাত বার করে এনে হতভম্ব পাঁচু ভাবে, এ কেমন ধাঁধা, কীসের পরিহাস ! কালও ধান ছিল গোলায়, কী করে উধাও হয়ে গেল ধান ? পাপী সে, চোরছ্যাঁচর, তার স্পর্শেই কি শূন্য হয়ে গেল ধানের গোলা ?

মণ্ডল সাঁতরা ভৌমিকরা ভোর ভোর গাঁ-সুদ্ধ লোক জুটিয়ে এনে শরৎ হালদারের ধানের গোলায় চড়াও হবে, টেনে বার করবে তার মজুত, সবার সামনে ওজন করে ন্যায্য দামে বেচে দেবে গাঁয়ের উপোসি মানুষদের—এ পরামর্শ চুপে চুপে শুনেছিল পাঁচু। খিদেয় খ্যাপা মানুষগুলি হানা দেবার আগে নিজের ঝুলিটা ভরে নেবার ফিকিরে এসেছিল ! সব মিথ্যে হয় গেল !

নিজের কপালে জোরে চাপড় মারে পাঁচু। দু চোখ তার ফেটে যায় জল আসার তাগিদে। তার ঝুলি নয় ভরল না তার দুরদৃষ্ট, শ-দেড়শো মানুষ যে হাঁ করে আছে কাল কিছু ধান পাবার আশায়, কাকে তারা অভিশাপ দেবে !

সোনা মণ্ডল আপশোশ করে বলে, রাতারাতি পাঁচশো মন ধান সরিয়ে ফেলল, কেউ টের পেলে না ? শুধু পরামর্শই হল, কেউ নজর রাখলে না ? আমি নয় গেছিলাম কুটুমবাড়ি—

ঋষি পাঞ্জা বলে, কেন গেলে ? নিশ্চিন্দি হয়ে তুমি কুটুমবাড়ি যেতে পার, মোরা ঘুমোতে পারি না নিশ্চিন্দি হয়ে ?

ঋষি তোকে আমি— আগুন বর্ষণ করে সোনা মণ্ডলের চোখ।

পরাণ ভৌমিক বলে, কেন ? কেন ধমকাবে ওকে ? দায়িক মোরা সবাই নই ? রাতারাতি পাঁচশো মন ধান সরাবে কুথা দিয়ে কেমন করে তুমি ভাবলে। মোরা ভাবতে পারি না রাতারাতি কুথা দিয়ে কেমন করে পাঁচশো মন ধান সরাবে ?

তা বটে, হক কথা।—চোখের নিমেষে শান্ত অনুতপ্ত হয়ে যায় সোনা মণ্ডল, মোদের সবার খেয়াল করা উচিত ছিল হালদার মশায় মস্ত ঘুঘু। কিন্তুক কী ব্যাপারটা বল দিকি, আঁা ! কুথা সরালো, কেমন করে সরালো ধান ?

এই কথাই ভাবে সবাই। ছেলে বুড়ো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে, মূক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধাঁধা যাই হোক, ভুল যাই হয়ে থাক, শরৎ হালদারকে টেনে এনে ছিঁড়ে ফেলা যায়। ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলা যায় বুড়ি কচি মেয়েপুরুষ যে আছে তার বাড়িতে—আগুন দিয়ে ছাই করে দেওয়া যায় তার বাড়ি। পাকা দালান তো তার একটা ভিটের তিনখানা ঘর, বাকি বাঁশ কাঠ খড়ের মহাল আগুন দিলেই দাউদাউ করে জ্বলবে। সেই আগুনের আঁচে পুড়ে না যাক গলে যাবে পাকা দালানের লোহার সিন্দুকের সোনা।

কিন্তু তাতে তো আর ধান মিলবে না। সে হবে শুধু প্রতিহিংসা।

ফিরে চলে যাচ্ছিল সবাই আপশোশ বুকে নিয়ে মিছামিছি হাঙ্গামা করাব স্বভাব তাদের নয়, বাংলা দেশের মানুষ কখনও প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেয় না। শরৎ হালদারেব কী দুর্মতি হল, কী খেয়াল চেপে গেল একটু বাহাদুরি করার, গোমস্তা নারায়ণকে সে পাঠিয়ে দিল তার প্রতিনিধি হিসাবে বজ্জাত লোকগুলিকে দু-চারটে ধমক ধামক দিতে !

ধান পেলে সোনা মণ্ডল ? উল্লাসে উত্তেজনায় বিকৃত ব্যঙ্গের সুরে চেঁচিয়ে বলল নাবায়ণ তার ফতুয়ার বোতাম আঁটতে আঁটতে, বলি ধান পেলে গোলায় ?

ফিরে যাচ্ছিল, ফিরে যেত সবাই, এই উৎকট ধিক্কারে গুম খেয়ে গেল গাঁয়ের শ দেড়েক পুবুষ। অসহ্য বিস্ময়ে তাকাল দু চোখে জ্বলন্ত প্রশ্ন নিয়ে।

গোমস্তা নারায়ণের কি অত খেয়াল আছে, চিরকাল মানুষ ঠেঙিয়ে সে তিরস্কার দূরে থাক, পেয়েছে পুরস্কার।

আবার সে চেঁচায়, বলি গোলার ধান ন্যায্য দরে বাঁটোয়ারা করলে না সোনা মণ্ডল ?

ধান কোথা গেল নারাণ ? সোনা মণ্ডল প্রশ্ন করল জোরালো গলায়। এগিয়ে গিয়ে বাঁ হাতে সে চুল মুঠো করে ধরল নারায়ণের, ডান হাতে মুঠো করে ধরল তার বুকের ফতুয়া, টেনে আনল সবার মধ্যে।

ধান কোথা গেল ?

আমি—আমি--হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল নারায়ণ। দম আটকে শ্বাস টেনে বিহ্বল হয়ে ভয়ার্ত কান্না।

এক ধাক্কায় তাকে উঠানে ফেলে দিল সোনা মণ্ডল। মুখ বাড়িয়ে থুতু ফেলল তার মুখে। ধারালো দা বাগিয়ে কোপ দিতে ছুটে যাচ্ছিল জোয়ান মজিদ, বাঁ হাতে সাপটে ধরে তাকে ও আটকাল।

বলল, দুৎ ! ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করব না।

সুবল মশাল জ্বেলেছে। এগিয়ে গেছে হালদারের গোয়ালঘরের চালায় আগুনের ছোঁয়াচ দিতে। সোনা মণ্ডল ছুটে গিয়ে মশাল কেড়ে নিল।

কী পোড়াবি ? ঘরবাড়ি ? ঘরবাড়ি কী শত্তুতা করেছে মোদের সাথে ? ঘর পুড়বে মিছিমিছি, শত্তুর পালাবে, কাল মিলিটারি এনে গুলির চোটে ভুলিয়ে দেবে রাইকিশোরীর নামটা !

সোনা মণ্ডলের গালে একটা চড় বসিয়ে দেয় নগেন কুণ্ডু, তার আশাভরসা, টাকা খরচ ব্যর্থ হয়েছে। মুকুলের দিকে তাকিয়েই তার জ্ঞান ফিরে আসে, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দেয় দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে, এঁদো ডোবার পাশ দিয়ে পড়িমরি ভাবে ছুটে অদৃশ্য হয়ে যায় আমবাগানে। মুকুল আর বটুক তার পিছু তিনবার হাঁক দেয় সোনা মণ্ডল গলা চড়িয়ে চড়িয়ে, মুকুল আর বটুক অনিচ্ছায় থেমে ফিরে আসে।

সোনালি তাজা রোদ উঠে গেছে ততক্ষণে। খানিক দূরে সরকারি সড়ক দিয়ে আওয়াজ তুলে ধুলো উড়িয়ে নন্দীপুরের বোঝাই বাসটা চলে গেল। আজ দেরি করেছে, সদর থেকে ভোর চারটায় ছেড়ে আরও আগে গাঁ ঘেঁষে বাসটা বেরিয়ে যায়, ওঠানামার যাত্রী না থাকলে থামেও না।

বাসটা যেন থেমেছিল এদিকে, রাস্তাটা যেখানে বড়োপাড়ার ঘরবাড়ির আড়ালে। টিনের ছোটো বাক্‌সোটি হাতে ঝুলিয়ে উল্লাসকে আসতে দেখা যায়। মামলাবাজি ব্যাবসা উল্লাসের, অনেক উকিল মোক্তারের চেয়ে তার অনেক বেশি উপার্জন ! সম্প্রতি এগারো জন চাষির নামে একদিনে হালদার সতেরোটা মামলা শুরু করেছে, তাই নিয়ে বড়োই ব্যস্ত হয়ে আছে, গাঁ আর সদর করে বেড়াচ্ছে হরদম।

জমায়েত দেখে সে তফাতেই থমকে দাঁড়ায়। হালদারের বাড়ির সামনে ভিড় জমাটা শুভচিহ্ন নয়। দিনকাল সুবিধে নয়।

কুক্ষণে অসময়ে বাস থেকে নেমেছিল উল্লাস, ক্ষুব্ধ ব্যাহত মানুষগুলির সামনে এসে পড়েছিল, তার বিরুদ্ধে যাদের বুকে বহুদিনের জমা করা পুঞ্জ পুঞ্জ ঘৃণার আগুন ! সোনা মণ্ডলের গায়ে চড় মেরেও কুণ্ডু ছুটে পালিয়ে বেঁচে গিয়েছে, কারণ মানুষটা সে যেমন হোক সে তাদেরই মানুষ, সাথে এসেছিল একই উদ্দেশ্যে, তার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল না যে হঠাৎ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে একটা দোষ করলেই বারুদের মতো ফেটে পড়বে। সবাই জানে, ও বেলাই হয়তো দেখা যাবে সোনা মণ্ডলের দাওয়ায় বসে সে কলকে ফুঁকছে, মাপ চেয়ে মিটিয়ে নিয়েছে ব্যাপারটা।

কিন্তু উল্লাসের ওপর বড়ো রাগ তাদের, বহুদিন ধরে মনগুলি জর্জরিত অভিশাপ হয়ে আছে। হঠাৎ গর্জন করে ওঠে আড়াই শো লোক, তাতে তলিয়ে যায় সোনা মণ্ডল আর অন্য কয়েকজন ঠান্ডা মাথা মানুষের প্রতিবাদ। চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায় ফন্দিফিকিরের জাল বোনা, মানুষের পর মানুষকে পথে নামানোর অধ্যবসায়, শিশির ভেজা ঘাসে চিত হয়ে উল্লাসের দৃষ্টিহীন পলকহীন চোখ মেলা থাকে আকাশের দিকে। বাতাসে উড়ে যায় ছিঁড়ে কুটিকুটি করা দলিলপত্র, নোটের তাড়াটা পর্যন্ত কেউ ছোঁয় না, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে।

জানালার ফাঁকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায় শরৎ হালদারের, বন্দুক ধরা হাতটা পর্যন্ত থরথর কাঁপতে থাকে।

ফুঁপিয়ে কাঁদে মেয়ে বিনু, ছেলের বউ রাধা গা থেকে গয়না খোলার ব্যস্ততায় আলগা অনন্তটা টানাটানি করে যেন খুলতে পারে না, হালদার গিন্নি মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে সিঁদুরমাখা লক্ষ্মীর পটটার সামনে, দাঁতে দাঁত চেপে মূক হয়ে থাকে হালদারের দুই জোয়ান ছেলে।

খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে কখন লোক গেছে থানায় খবর দিতে, এখনও এল না নৃপেন দারোগা দলবল নিয়ে। এমনই বিপদে দয়া করে ছুটে আসার অগ্রিম মূল্য নিয়ে রেখেছে, তবু।

হালদারের জন্য জীবন দেয় উল্লাস, এই তার শেষ কাজ। কিন্তু জীবন দিয়েও যেন অপকার করে যায় শেষবারের মতো। শূন্য গোলা দেখে ক্রোধে, ক্ষোভে ফুসতে ফুসতে ফিরেই যেত ধৈর্যহারা মরিয়া মানুষগুলি, হালদারের বাড়ি চড়াও হত না। ধান তারা লুটতে আসেনি কিনতে এসেছিল গায়ের জোরে—তার বেশি আর কিছু করার কথা মাথায় ছিল না। উল্লাসের অনেক দিনের পুরানো পাওনা ঝোঁকের মাথায় মিটিয়ে দিয়ে মনের গতি যেন ঘুরে গেছে তাদের। গোলার ধান কোথায় গেল এ প্রশ্নের জবাব হালদারের কাছেই আদায় করার সাধ জেগেছে।

জবাব চাই, ধান কী হল। জবাব দিতে হবে হালদারকে !

উঠানে দালানের সামনে তারা ভিড় করে দাঁড়ায়। ডাকে, হালদার মশায়, হালদার মশায় !

দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। কিছুক্ষণ কারও সাড়াশব্দ মেলে না। তারপর ধীরে ধীরে জানালার একটা পাট খুলে গিয়ে শিকের ফাঁকে দেখা যায় বড়ো মেয়ে বিনুর ভয়ার্ত মুখ।

বাবা বাড়ি নেই।

বাড়ি আছে, লুকিয়ে আছে, গর্জন করে ওঠে তারা, আসতে বলো হালদার মশায়কে, নইলে দরজা ভেঙে ফেলব।

বন্দুক তোলে হালদার, বড়ো ছেলে ঠেকিয়ে রাখে। বলে, একটা বন্দুকে কী হবে ? আরও খেপে যাবে সবাই।

বোনকে সরিয়ে সে জানালায় দাঁড়ায়। বলে, কী চাই সোনা মণ্ডল ?

গোলার ধান কোথা গেল ? মোরা কিনতে এয়েছি ধান।

ধান নেই, বেচে দিয়েছি।

কাকে বেচলে ? কখন বেচলে ?

জগৎ কুণ্ডুকে বেচে দিয়েছি। রাত্রে ধান নিয়ে গেছে।

বেচে দিয়েছ ! গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরছে, তুমি ধান বেচে দিয়েছ !

জানালার পাট ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেয় বড়োছেলে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে জানালা নয়, দরজাই খুলে দিতে হয় পরাণ ভৌমিক আর সোনা মণ্ডলকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার জন্য। রাতারাতি পাঁচশো মন ধান সরিয়ে নিয়ে গেছে সাতকুঁড়ার জগৎ কুণ্ডু, কিন্তু গাঁয়ের লোক কেউ টের পায়নি, এটা সহজে বিশ্বাস করতে চায়নি তারা। দালানের তিনটে কোঠা খুঁজে দেখার দাবি করেছে।

শুধু দুজন ভেতরে আসবে এই শর্তে দরজা খুলেও দিতে হয়েছে।

ঘরে ফিরে পাঁচু কাপড়ে বাঁধা আধসেদ্ধ ভেজা চালগুলি টুকরিতে ঢেলে রাখে। বুঁচি খুশি হয়ে বলে, আ মর ! কোথাকার কুড়োনো চাল ?

পাঁচু হাসে। উনান থেকে ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দালানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল হালদারের বড়োবউ, হাঁড়ি থেকে আধসিদ্ধ চালগুলি পাঁচু ছেঁকে কোঁচরে বেঁধে এনেছে।

গভীর রাত্রে লরি এসেছিল জগৎ কুণ্ডুর, দশজন লোক নিয়ে। সরকারি রাস্তায় থেমেছিল লরি।

ইঞ্জিন না চালিয়ে নিঃশব্দে লরিটা ঠেলে আনা হয়েছিল হালদারের বাড়ির কাছে, হাতে হাতে গোলার ধান কিছুক্ষণের মধ্যে উঠে এসেছিল লরিতে, আবার ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বড়ো রাস্তায়।

দিনের বেলায় প্রকাশ্যে কতবার এসেছে লরিটা, ধানচাল নিয়ে গেছে গাঁয়ের লোকের চোখের সামনে দিয়ে, তখনও মরিয়া হয়ে ওঠেনি গাঁয়ের লোক পেটের জ্বালায়। লরির চাকার অনেক দাগের সঙ্গে মিশে গিয়েছে গতরাত্রির আনাগোনার নতুন দাগ।

জগৎ কুণ্ডুর তিনটে আড়ত, একটা গাঁয়ে, একটা নন্দীপুরে, একটা সদরে। তার কোনোটাতেই যায়নি ধান নিয়ে লরিটা, বড়ো সড়ক ধরে ক্রোশ দুই নন্দীপুরের দিকে গিয়ে বাঁয়ে মোড় ঘুরেছিল অন্য রাস্তায়, হাজির হয়েছিল তিন ক্রোশ তফাতে নদীর ধারে পলাশডাঙায়।

ধানচাল চোরা চালানের এখানে একটা ঘাঁটি আছে কুণ্ডুর।

জানে অনেকেই, এক রকম প্রকাশ্যভাবেই চোরাচালান চলে। গোপনতা শুধু এতটুকু যে সরকারিভাবে ব্যাপারটা স্বীকৃত হয় না।

টিনের চালা, সিমেন্ট করা মেঝে। অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে ধানগুলি মেঝেতে ছড়িয়ে ঢেলে ফেলা হয়। এক কোণে অল্প কিছু চাল পড়েছিল মেঝেতে চাল ও তুষের গুঁড়ো। বোঝা যায় গুদামে চাল জমা হয়েছিল, সম্প্রতি সরানো হয়েছে, এখনও মেঝে ঝাঁট দেওয়াও হয়নি। অলস স্তিমিত চোখে তাকায় নারায়ণ, শস্যের গন্ধ তার নাকে লাগে না, নাক ভোঁতা হয়ে গেছে। ছোটো ঝাঁটাটি হাতে নিয়ে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে বাজু, মা ও মেয়ে। ধান গুদামঘরে তুলতে যে কটি দানা পথে মাটিতে ঝরে পড়বে, ঝেঁটিয়ে ওরা কুড়িয়ে নেবে। খেয়ে বাঁচবে।

ধান যারা আগে গুদামে তুলেছিল তাদের একজন বোঝা থেকে কিছু ধান হাত বাড়িয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়, আড়চোখে চেয়ে হাসে। বাজু তার শীর্ণ মুখে খুশির ভাব ফোটাতে চেষ্টা করে। মাটিতে ঝরে পড়া শস্যকণা কুড়িয়ে নেবার একচেটিয়া অধিকার দিয়েই তাকে কিনতে পেরেছে নারায়ণ। তার ওপর এই দয়া, খেলার ছলে আরও দুটি বেশি শস্য ছিটিয়ে দেওয়া।

ছোটো ঘাট, খেয়া পারাপার হয়, কয়েকটি নৌকা আসে যায়, কয়েকটি ঘাটে বাঁধা থাকে, মেয়েপুরুষ নাইতে বা জল নিতে আসে। সকালে ধানচালের গুদামটির পাশে লাগানো কেরোসিনের দোকানের বারান্দায় চেয়ারে বসে নারায়ণ ঝিমোয়, বান্দা মেপে মেপে কেরোসিন বেচে। তেল দিতে যেন হাত ওঠে না তার, পয়সা নিয়ে দুফোঁটা তেলও যেন দেয় অনিচ্ছায়। সবাই পায় না তেল, পাওনা তেলের দশভাগের এক ভাগও পাবে না, তেল ফুরিয়ে যায়। এটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান দশ টিনে দু টিন এমনিভাবে বাঁধা দরে বেচে হাট বজায় রাখতে হয়। বাকিটা নির্বিবাদে বেচা যায় চোরা দরে।

নৌকার মাঝি এসে দাঁড়ায়। হাই তুলে নারায়ণ বলে, দেশপুরের কলে পৌঁছে দিবি যান।

মাঝি বলে, দিনে বোঝাই দিতে বাবু বারণ করেছে না?

দুস্তেরি বারণ করেছে, নারায়ণ ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই বলে, তোল তুই। কী হবে? কোন শালা কী করবে?

তা ঠিক কিছুই হয় না, কেউ কিছু বলে না সরকার চোখের ওপর বুক ফুলিয়ে চোরাই ধানচাল চালান দেওয়া যায়।

কিন্তু চিরদিন কি যায়? চিরদিন কি মানুষ মুখ বুজে থাকে কিছু বলে না।

ওরা কারা আসছে দল বেঁধে? কেরোসিনের খদ্দের? কেরোসিনের খদ্দের তো এমন দল বেঁধে আসে না। সুধীর, কানাই জৈনুদ্দীনদের দেখা যাচ্ছে। একটা কিছু হাঙ্গামা করতে আসছে। নারায়ণ সজাগ হয়ে ওঠে।

তোমার গুদামে চোরাই ধান আছে।

তুমি কে হে বাবু? আমার গুদামে কী আছে না আছে তোমার তাতে কী?

সুধীরের মেজাজ বিগড়েই ছিল, সে চিৎকার করে বলে, আবার চোখ রাঙায়! বাঁধো ব্যাটাকে, কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলো থানায়।

সুধীর বলে, থামো, থামো। দারোগাবাবু আসুক। ধান বয়েছে, আসামি রয়েছে, এ তো আর চাপা দেওয়া চলবে না।

থানার দারোগা বিধুভূষণ এসে পৌঁছতে পৌঁছতে খবর ছড়িয়ে প্রকাণ্ড ভিড় জমে যায়। উৎসুক, উত্তেজিত হয়ে জনতা প্রতীক্ষা করে কী ঘটে দেখবার জন্য। এতকাল ধরে এমন খোলাখুলিভাবে এখান দিয়ে ধানচালের বেআইনি চালান চলে আসছে যে লোক প্রায় খেয়াল করতেই ভুলে গিয়েছিল কারবারটা আইনসঙ্গত নয়। নারায়ণের মুখ শুকিয়ে গেছে, চোখ তার পিটপিট করে।

এ অঘটন তাব কল্পনায় ছিল না। সুধীর কানাইরা যে দল বেঁধে এসেছিল সেটা সে গ্রাহ্যই করেনি, থানায় খবর গেছে শুনে মনে মনে একটু হেসেই ছিল বরং। কিন্তু দেখতে দেখতে যেভাবে চারিদিক ভেঙে এসে জমা হয়েছে মানুষ, খুশির উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে প্রতীক্ষা কবছে পুলিশ এসে তাকে কী ভাবে বেঁধে নিয়ে যাবে দেখবার জন্য, তাতে ভড়কে গিয়েছে নারাযণ। কিছু তাব হবে না শেষ পর্যন্ত সে জানে। তবু একটা অদ্ভুত আতঙ্ক চাপ দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডে, দম যেন আটকে আসবে। জনতাব এই ভয়ংকর বিরোধী মূর্তি সে জীবনে কখনও দেখেনি।

বিধুভূষণও ভড়কে যায় ব্যাপার দেখে।

বলে, কী ব্যাপার, কী ব্যাপার, হয়েছে কী ! ভিড় কীসেব !

বলে, ধান ? চোরাই ধান ধবা পড়েছে ? তাই নাকি ! তা এত ভিড় কেন ?

বলে, কী হে পবাণ, ব্যাপারটা কী ?

আমি কী জানি, নারায়ণ বলে, কর্তা ধান পাঠাল—

আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। শুনছি সব। প্রায় ধমক দিয়ে বলে বিধুভূষণ, লোকটাব মূর্খতায় সে চটে যায় ! কর্তাকে আবাব টানবার চেষ্টা কেন এব মধ্যে ? বিধুভূষণ যেন জানে না কে তাব কর্তা, কে ধান পাঠিয়েছে !

সুধীব কানাইদের বলে বিধুভূষণ, ওহে তোমরা ভিড় ভাগাও, তোমবাও যাও। ধবিয়ে দিয়েছ, এবার যা করার আমায করতে দাও।

সুধীব কানাইরা নড়ে না। ভিড় এক পা পিছু হটে না।

সুধীব বলে, সবার সামনে ধান দেখুন, সাক্ষীদের নামটাম লিখুন—

ব্যাটাকে গারদে পুবুন !—একজন চেঁচিয়ে ওঠে।

ধীবে ধীরে একটা সিগারেট ধরায় বিধুভূষণ, সুধীবদেব দিকে, পিছনেব জনতাব দিকে দু চাব বার তাকায, তারপর নাবাযণকে বলে, গুদামটা খোলো তো হে। কত ধান আছে ?

দরজা খুলে একবাব উঁকি দিযে দেখেই বাইবে থেকে তালা এঁটে সিল কবে দেওযা হয, লেখালেখি হয় বিবরণাদি সাক্ষীব নামধাম, তাবপব একজন পুলিশকে গুদামেব সামনে মোতায়েন রেখে নারায়ণকে নিয়ে বিধুভূষণ চলে যায় !

ভিড়ের মানুষ তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফেরে।

সেই দিন জগৎ কুণ্ডু যায় সদরে, হাজিরা দেয জোনসেব বাংলোয়। জোনস একা থাকে, তাব মেম থাকে কলকাতায়। শহব ছেড়ে সে নড়ে না, টাকা চেয়ে পাগল কবে তোলে জোনসকে। না দিয়ে উপায় থাকে না, বড়ো মুশকিল হয টাকার ব্যাপাবে কড়াকড়ি কবলে।

পরদিন দেখা যায কেবোসিন তেলেব দোকানের সামনে চেযাবে বসে ঝিমোচ্ছে নাবাযণ। পুলিশের তত্ত্বাবধানে গুদামের ধানগুলি থানাব কাছে এক চালা ঘবে চালান হযে যায়, স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝেতে জমা হয। খড়েব চালার অনেকগুলি ফোকর দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারে মেঘম্লান আকাশের আলো।

সুধীর কানাইরা কয়েকজন দেখা করতে যায় বিধুভূষণের সঙ্গে, জিজ্ঞাসা করে, কী ব্যাপার হল ?

বিধুভূষণ বলে, খোঁজখবর রাখবে না কিছু, হাঙ্গামা বাধিয়ে বসবে। কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে তোমাদের ? লাইসেন্স আছে নারাযণের, জগৎবাবু ওর নামে পারমিট করিয়ে রেখেছিলেন। নারাণেরও বুদ্ধি বেশি, আরে বাবা তুই লেজিটিমেট এজেন্ট সরকারের, জগৎবাবু তোর লাইসেন্স পারমিট সব করে রেখেছেন না রাখেননি, সে খরবটাও তুই জানিস না ?

ধানটা তা হলে সরান হল কেন ?

তোমাদের জন্য, বিধুভূষণ অনুযোগের সুরে বলে, এ ধানটা নিয়ে হাঙ্গামা করলে তোমরা, ফের যদি হানা দাও নাবাণের গুদামে, গোলমাল কর। আমার হেফাজতে রাখার হুকুম হয়েছে।

এ যুক্তি ভালো। দারুণ অসন্তোষ বুকে নিয়ে ফিরে যায় সুধীরেরা। মেঘ ঘনিয়ে আসে আকাশ কালো করে। বৃষ্টি নামে অজস্র ধারে। আবার রোদ ওঠে, আবার বৃষ্টি হয়। রাত্রে শেয়াল ঘুরে যায় ধান রাখা চালাটার চারপাশে। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমে ক্রমে অসহ্য হয়ে ওঠে সে গন্ধ। তারপর একদিন সদরে চালান দেবার ব্যবস্থা হলে চালাটার দরজা খুলে দেখা যায়, ধানগুলি পচে গেছে।

সাথি

আবার মারে গগন, আরও জোরে মারে। এবার বাখারির ভোঁতা ধারেও পিঠের চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়ে আসে। মরা ঘামাচিতে চামড়া কর্কশ সোহাগীর, স্থানে স্থানে দাদের চাপড়া।

নিষ্ঠুরতার নেশায় উন্মত্ততা এসেছে, থরথর করে সর্বাঙ্গ কাঁপে গগনের, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি চলে অবিরাম, আরক্ত চোখে ঝাপসা দেখায় জগৎ। আরও মারবে, আরও ! মারতে মারতে কখন তৃপ্তি আসবে গগন জানে না, মরে যাবে কিনা সোহাগী তাও জানে না, মেরে মেরে আজ সে ওকে টের পাইয়ে দেবে রোজগেরে স্বামীর কত জোর খাটে।

পরনের কাপড়খানা খুলেই খুঁটির সঙ্গে সোহাগীকে বেঁধেছে মারার সুবিধার জন্য সামনের দিকটা খুঁটিতে লাগিয়ে। মুখ দেখতে না পাওয়ায় শুধু কান্না আর কাতরানি শুনে তেমন যেন জুত হচ্ছে না। কান্না একটু ঝিমিয়ে আসায় প্রাণপণ শক্তিতে পাছায় আঘাত করে রক্ত ঝরিয়ে গগন সামনে যায় সোহাগীর মুখখানা দেখতে।

ঘাড় কাত করে দাঁত দিয়ে খুঁটির বাঁশটা কামড়ে ধরেছে সোহাগী। তাই তার এখন কান্না নেই, গলা থেকে শুধু একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

যন্ত্রণায় বিকৃত ভয়ার্ত বিহ্বল মুখ দেখে রাগ আরও চড়ে যায় গগনের। কড়া-পড়া চাষাড়ে হাতের প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দেয় সোহাগীর গালে।

আর খাবি ? আর খাবি চুরি কইরা ?

বড়ো আশ্চর্য ঘটনা ঘটে তখন। কেঁদে ককিয়ে সোহাগী আবার মাপ চায় না, জানায় না আর সে মরে গেলেও চুরি করে খাবে না স্বামীর ভাগের অন্ন, বরং কাতরানি থামিয়ে আকাশে গলা চড়িয়ে ঘোষণা করে :

খামু ! চুরি কইরা খামু ! খুন কইরা খামু !

তার বেপরোয়া বিদ্রোহে একটু ভড়কে যায় গগন, থতোমতো লাগে।

খাবি ?

খামু। ক্যান খামু না ? ভাত না পাই দাও দিয়া তোমারে কাইটা ব্যানুন রাঁইধা খামু।

এমন খিদে সোহাগীর এমন বিদ্রোহ ! ভাত না পেলে স্বামীকে কেটে মাংস রেঁধে খাবে ! তারপর সোহাগী হাউহাউ করে কাঁদে। এতক্ষণ পায়ে ভর ছিল, এবার একেবারে গা এলিয়ে দেওয়ায় মরমর করে ওঠে ঘুণ-ধরা বাঁশের খুঁটি। সুতরাং বাঁধনের কাপড়টা খুলে তাকে মুক্তি দেয় গগন। সোহাগী গায়ে কাপড় জড়াবার চেষ্টা করে না, হুড়মুড় করে মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে মাটিতে মুখ গুঁজে থাকে।

চাঁচের বেড়ায় অসংখ্য ফুটো দিয়ে সকালের রোদ আর আলো সরু মোটা দিঘল হাত বাড়িয়েছে ঘরের ছায়াচ্ছন্ন গোপনতায়। এ যেন গভীর শোকাবহ অবস্থায় আনন্দ-ভরা উৎসাহী প্রকৃতির মিতালির সংকেত। সারারাত মাঠে ধান পাহারা দিয়েছে গগন। ভোরে ধান কাটতে কাটতে উৎসুক চোখে বারবার তাকিয়েছে গাঁয়ের পথের দিকে, উপোসি রাতের জমাট খিদেয় টং ধরে আছে সমস্ত শরীর, কাস্তে চালাতে হাত আড়ষ্ট হয়ে আসছে—তবু যে কলের মতো খেটে চলেছে সে শুধু এই ভরসায়—ভাত কটি নিয়ে এখুনি সোহাগী এসে পড়বে।

বেলা বেড়েছে, সোহাগী আসেনি। রাগ বাড়তে বাড়তে মাথা ঘুরে গেছে গগনের। কাস্তে দীনুর কাছে জমা রেখে ঘরে এসেছে ব্যাপার জানতে।

কাস্তেটা যে আনেনি হাতে করে সেটা পরম ভাগ্য দুজনেরই। রাগের মাথায় গোড়াতে সোহাগীর গলায় বসিয়ে দিতে পারত চকচকে কাস্তেটা, যে গলা দিয়ে তার ভাগের ভাত পেটে তল করেছে সোহাগী !

এবার দ্রুত ঝিমিয়ে আসে গগন, রাগের জ্বালা ক্ষোভের জ্বালা নিষ্ঠুরতার উত্তেজনা সব জুড়িয়ে আসে। ঝিমঝিম করে মাথা। এক অকথ্য দুঃখের চাপ ঠেলে উঠতে চায় বুকের ভেতর থেকে, গলা ছেড়ে হাউমাউ করে একচোট কাঁদতে পারলে সে বেঁচে যেত।

মাঠে ফিরে যাবে ? পারবে খেটে যেতে পেটে শুধু জল বোঝাই নিয়ে ? মাঠে যেতেই হবে। খাটতে পারবে কী পারবে না, কতটুকু পারবে, মাঠে গিয়েই তা যাচাই করতে হবে। ধান কেটে তুলতেই হবে তাড়াতাড়ি। হয়তো সময় আছে শুধু আজকের দিনটি, আবার হানা দিয়ে ধান কেড়ে নেবার মতো দলবল সংগ্রহ করতে তার বেশি সময় হয়তো লাগবে না জোতদার ভূপতির। ভূপতি হানা দেবার আগে ধান নিরাপদ করা চাই। লেঠেলকে ঠেকাতে প্রাণ যদি দিতে হয় তো দেবে, কিন্তু মিছামিছি প্রাণ দিয়ে সুখ নেই, প্রাণটা স্থায়ীভাবে বাঁচাবার উপায় ধানগুলি বাঁচানোর ব্যবস্থা করে নিয়ে তারপর নিশ্চিন্ত মনে মবা চলবে, তার আগে নয়।

এদিকে কী ফ্যাকড়া বাঁধল দ্যাখো। এমন করে মেরে এখন বউটাকে ফেলে সে কেমন করে মাঠে যায় ? ঘাটে গিয়ে যদি ডুবে মবে সোহাগী ? যদি গলায় দড়ি দেয় ! যেদিকে দুচোখ যাবে চলে যদি যায় মনের খেয়ায় ! কাব জন্য তখন তাহলে সে ধান কাটবে মাঠের ?

নে যা বেশ কবছস। ওঠ।

উদাসভাবে বলে গগন ! সোহাগীব সব অপবাধ মাপ করে ব্যাপাবটা শেষ করে দেবার ভঙ্গিতে। সোহাগী নড়ে না, তাব সাড়া মেলে না।

মাঠে যামু। কাপড়টা পর। ঝাঁপ খুলুম না ?

সোহাগী নড়ে না।

এক ঘটি জল দে। জল দিয়া পেট ভরাইয়া খাটি গা যাই, করুম কী !

বড়ো অসহায় মনে হয় নিজেকে গগনের। সোহাগীর নরম হবার শান্ত হবাব জন্য যথেষ্ট সময় দেবার উপায় নেই, গবিব বেচারার জীবনে তাড়াহুড়ো তাগিদ পড়ে গেছে চারিদিক থেকে। তাড়াতাড়ি ঘটিবাটি বাঁধা দিয়ে চড়া সুদে দুটি চারটি ধানচাল কর্জ করো নইলে, উপোসি ধড়টা ছেড়ে যাবে প্রাণপাখি। দিনরাত চোখ পেতে বাখা চারিদিকে, সতর্ক প্রস্তুত হয়ে থাকো, ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যাবার দাখিল হয়েও তাড়াতাড়ি ধান কেটে তুলে সামলাও, কখন হানা দিয়ে কেড়ে নিয়ে যাবে জোতদার। মারধোর করাব জন্য তাড়াতাড়ি ঠান্ডা করো বউকে, উপোসের জ্বালার সঙ্গে শাসনের ঘেন্নায় সে পাছে কিছু করে বসে। একটা বেলা স্থগিত রাখার উপায় নেই কাজটা, সব কিছু ঝটপট চটপট একসাথে করা চাই, কোনোটার সবুর সইবে না ! এতও কি মানুষের সয় ?

মরণ তো আছেই—গগন বলে খেদের সঙ্গে, এমনেও মরুম ওমনেও মরুম। লাইঠাল পুলিশ নিয়ে আইবো, ধান তো ছারুম না। লাঠির ঘায় মাথা ফাটব না তো গুলি বিধবো বুকের মদ্যি। মরুম ঠিকই, তুই এমন কইরা মারিস না !

মাথা একবার উঁচু করে আবার সোহাগী মুখ গোঁজে।

তাই কর তুই, ঝড়ের মতো নিশ্বাস ফেলে গগন, দাও দিয়া কাইটা ব্যানুন রাঁইধা খা আমারে, মাঠে মইরা পচুম ক্যান শ্যাল শকুনে ছিড়া খাইবো, তর পেট ভরুক !

যা তা কইও না কইলাম ! সবেগে উঠে বসে সোহাগী, মারছ ধরছ সইয়া গেছি, যা তা কইলে সমু না কইলাম !

খানিক পরে সোহাগীই জল এনে দেয় টিনের মগে। এক ঘটি জল যে চেয়েছিল গগন সেটা নিছক অভ্যাস, ঘটি গেছে অনেকদিন আগেই।

যাবার জন্য গগন পা বাড়িয়েছে, সোহাগী বলে, ভাত নিয়া যামুনে।

পাবি কই ?

পামু। চাল জোগার করুম। মার খেতে খেতে যে ভাবে সোহাগী বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল যে শুধু চুরি করে স্বামীর ভাগের ভাত খাওয়া নয়, ভাত না জুটলে গগনকেই দা দিয়ে কেটে ব্যানুন রেঁধে খাবে তেমনই বিদ্রোহের ভঙ্গিতে সে ঘোষণা করে, চুরি কইরা পারি ডাকাতি কইরা পারি চাল জোগার করুম। নন্দীগো ঘরে কাঁড়ি কাঁড়ি চাল—

দিব না। মাথা নাড়ে গগন।

দিব না ? না দিলে খুন করুম, দাও দিয়া গলা কাটুম।

আমগাছটার পাশ দিয়ে রোদ পড়েছে শীর্ণ ক্লিষ্ট মুখে, কী যেন জ্বলজ্বলে সে মুখেই, কীসের পণ। শেষরাত্রে কাঁপিয়েছিল, শীত এখন মিঠে। নতুন করে আজ একবার মুগ্ধ হয় গগন নতুনভাবে তার বউয়ের চোখে চোখে চেয়ে। এদিক ওদিক থেকে সাড়া মিলছে মানুষের, রোগা গোরুটির গলার দড়ি ধরে নিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়েছে কাটু সেখের বউ গোরুটিকে পথে-পড়া নতুন খড় মুখে তুলে নেবার সুযোগ দিতে, তাকিয়ে আছে তাদের দিকে।

আস্তে আস্তে আবার ঘরে ঢুকে গগন ডাকে, শুইনা যাও।

সোহাগী কাছে এলে তার একখানা হাত ধরে গগন, জন্ম জন্মের দোষ ত্রুটি অপরাধ পাপের জন্য মার্জনা চাওয়ার মতো এক অদ্ভুত আবেগের সঙ্গে বলে, শোনো তোমারে কই। আর মারুম না ! গায়ে তোমার হাত দিমু না যা কর তুমি, কোনোদিন যদি তর গায়ে হাত তুলি সোহাগী—

গায়েন

গান গেয়ে ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষকে এতকাল কাঁদিয়ে আসছে যে লোকটা, তার ফোকলা মুখে গালভরা হাসি দেখলে জগৎ যেন বদলে যায়। পাকা টুলটুলে খুশির ফলটি ফেটে গেছে হঠাৎ, এখন থেকে পৃথিবীতে আর আনন্দের অভাব হবে না। এই বুড়ো বয়সে গায়ের চামড়ার রংটাতেও যেন তার পালিশ আছে ঘন পুলকরসের।

সম্প্রতি কিছুকাল জের চলেছে বিষণ্ণতার, মন খারাপের।

শিংমাছের ঝোল দিয়ে ভাত বেড়ে দেয় আমোদ, বলে, কাঁদছ কেন ? হেথা হোথা গাইতে যাও, ফিরে এসে মুখটা হাঁড়ি। মারে নাকি ধরে ধরে ?

মুখে হাসি ভাঙে। হাতের গরাস নামিয়ে রাজেন সুর করে বলে,

সাধে কি কেঁদে মরি, ছিঁড়ে দাড়ি,
মেয়্যার হয় না শ্বশুরবাড়ি,
জগৎজনা দেয় টিটকারি,
বুড়ো রাজেনের গলায় দড়ি—

মুখ ছোটো হয়ে হাসে আমোদের, চোখ হয় বড়ো বড়ো। এতদিনে তবে জানা গেল গায়ন সেরে ফিরে এসে রাজেন দাসের মন গুমরিয়ে থাকার কারণ ! আর কোনো খুঁত পায়নি, বড়ো মেয়ে ঘরে রাখার ছুতোয় এবার সবাই টিটকারি জুড়েছে, অপদস্থ করতে চাইছে রাজেনকে। কে করছে, কারা উদ্যোগী, জানে আমোদ। এখনও এই বুড়োর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যারা মাথা তুলতে পারে না, এই বুড়োর আসরে লোক ভেঙে পড়ে কিন্তু যাদের আসর খাঁ খাঁ করে শ্রোতার অভাবে !

বিদেয় করো। মোকে বিদেয় করো শিগগির ! বলে আমোদ মনের দুঃখে কাঁদে।

কী যন্ত্রনা, সে কথা নয় ! রাজেন বলে ভড়কে গিয়ে, মনে কথা এল, গেয়ে দিলাম, একটু তামাশা হল নিজের সাথে —তোর কথা মোটে নয়। তবে কিনা চিন্তা একটা জেগেছে। ভাবি কী, এবার বুঝি মোর বিদেয় নেবার পালা ক্ষমতা কমে আসছে।

ইস !

হাঁ। আসর তেমন জমাতে পারি না, উশখুশ করে লোকে, ইদিক উদিক চায়, খুকখুক কাশে, সিকনি ঝাড়ে। না বলে উড়িয়ে দিলে চলবে কেন, চোখে দেখি টের পাই।

দু-চারগ্রাস ভাত খায় রাজেন। —মোর হয়ে এয়েছে নাকি কে জানে !

বলোনি ও কথা !

না বললে চলছে কীসে ? তিন কুড়ি তো হয়ে এল বয়েস।

শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলছে রাজেন দাস, কী ভয়ানক কথা এটা ! জগৎ যেন স্তব্ধ হয়ে শুনতে চায় এটা কী ব্যাপার, অবশ্য নাকি খুঁজে পাচ্ছে না বাতাস, সাড়া তুলতে পারছে না মর্মবধ্বনির ? রাজেন দাসের গানে সাড়া দিচ্ছে না মানুষ ? যতই অসম্ভব হোক, কিছুদিন থেকে আসর সত্যই জমাট বাঁধছে না রাজেনের। গোলার হাটে হাজার মানুষ, গঞ্জের মেলার অগুণতি লোক, নন্দী বসুর উৎসবে সদর ঝাঁটিয়ে জড়ো করা ছেলেবুড়ো, মুগ্ধ হয়ে শুনে গেছে আগাগোড়া, শুধু শুনে গেছে। অভিভূত হয়ে থমথম করে নির্জনতা, আবেগে উত্তাল হয়ে ওঠেনি, বিনা শর্তে সমবেতভাবে তার হাতে তুলে দেয়নি অশ্রু নিয়ন্ত্রণের শেষ ক্ষমতা। একবার নয়, একদিনের একটি আসরে নয়, এমনই ঘটে আসছে আজকাল।

রাজেন টের পায়। এই করেই তার জীবন কাটল, পাতলা কটা হয়ে এল ঘন কালো চুল, ভাটা ধরল দেহের শক্তিতে। জনতা তার চিরদিনের প্রেয়সী, কাঁধে ঘুরিয়ে উড়ুনি কোমরে বেঁধে কোঁচা ঝুলিয়ে বরবেশে সবার মধ্যে দাঁড়ালেই যে বক্ষলগ্না প্রিয়ার মতো অনুভব করে সমাবেশের হৃৎস্পন্দন, শুনতে পায় মনোরঞ্জনের ফরমাশ, জানতে পারে হাসিকান্নার আবেগ, আবেশ, বিহ্বলতার গভীরতা। কবে গায়নে শুধু একঘেয়ে পচা নোংরামির রস পরিবেশন বন্ধ করেছিল গুরুর সঙ্গে বিদ্রোহ করে, গাইতে শুরু করেছিল পুরাণকথা নিজের মতো লিখে নিয়ে, মাঝে মাঝে তারই মধ্যে স্বদেশিয়ানার বুকনি ঢুকিয়ে দিতে দিতে করে পুরাণকথা ছেড়ে চলে এসেছিল দেশের কথায়, সব তার স্মৃতিতে জড়িয়ে গেছে। কত রাত কত চোখের কত জলে সে বসুমতী ভিজিয়েছে দেশমায়ের দুঃখের কাহিনি গেয়ে। পুলিশ ধরে জেলে দিয়েছে তাকে জরিমানা করেছে।

কবি জীবন তার সার্থক হয়েছে এই বুড়ো বয়সে, ধন্য হয়েছে চরম রূপে, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের গায়ন করে। প্রথম বন্যা নিয়ে গেয়েছিল গোলার হাটে, ভয়ে ভয়ে। একেবারে চলতি ব্যাপার, তখনও মুছে যায়নি বন্যার চিহ্ন দেশ থেকে বা মানুষের মন থেকে, জের থামেনি সর্বনাশের, একেবারে কাঁচা ঘা জমবে কী গান ? মানুষ তো চটবে না তাদের মারাত্মক দুর্ভাগ্য নিয়ে ছড়া গাঁথার বাহাদুরিতে, কাঁচা ক্ষতে খোঁচা দিয়ে আসর জমানোর চেষ্টার পাগলামিতে ? গান শুরু করার পরেই কোথায় ভেসে গিয়েছিল ভয়ভাবনা, দ্বিধা-সংকোচ, পাগল হয়ে মানুষ শুনেছিল মাঝরাত্রি পার করে, কেঁদেছিল মানুষ শিশু ভেসে যাওয়া মানুষ মায়ের সজল চোখে বাছুর-মরা গাভীর গলায় হাতবুলানোর বর্ণনায়, হেসেছিল মানুষ ভুঁড়িওলা নায়েববাবুর তৃতীয় পক্ষের আদরিণী বউয়ের ধাক্কায় খাট থেকে মেঝেয় বন্যার জলে পড়ে হাবুডুবু খাওয়ার কল্পনায়, ক্ষোভে নিশ্বাস ফেলেছিল মানুষ সবকারি বিলিফের নির্লজ্জ অব্যবস্থায়। সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে।

গঞ্জের মেলায় প্রথম গেয়েছিল দুর্ভিক্ষ ধরে, বিরাট আসরে, জনসমুদ্রে। মাঠের ধান কোথায় গেল, মানুষের খাবার কে সরাল, অসহায় মানুষ কী ভাবে কেঁদে ককিয়ে উপোস দিয়ে উজার হল, মায়ের বুকে শিশু মল, বাপ মেয়ে বেচল, স্বামী বউ বেচল, সাদা বাজার রাজ্য কেমন ছেয়ে গেল সাদা কঙ্কালে। রাত ভোর করে এনেছে রাজেন দাস, পাঁচ-সাতহাজার মানুষের হৃদয়ে যেন ঝড় বইয়ে নিয়ে গেছে দুঃখের, হতাশার—চোখ শুকনো থাকতে দেয়নি একজনেরও।

তিরিশ বত্রিশ বছরের গায়ন-সাধনার চরম পুরস্কার, পরম সিদ্ধি। বড়ো সে ছিল, সেবা সে ছিল কবির মধ্যে—একমাত্র, অদ্বিতীয় কবি বলে তারপর লোকে মেনে নিল তাকে। আর কেউ নেই, অন্য সবাই তুচ্ছ, প্রসাদ পাবার যোগ্য নয় রাজেন দাসের। সাফল্যের নেশায় নিজেও যেন কেমন মাতাল হয়ে গেল রাজেন। সেরা কবিগায়ক হয়েও দুঃখ তার ঘোচেনি কোনোদিন, অনটন কাটিয়ে স্বচ্ছলতার স্বপ্নই শুধু দেখেছে সে চিরকাল : এমনই অদ্ভুত কল্পনাতীত জনপ্রিয়তার মধ্যেই দারিদ্র্য দূর করার স্বপ্ন। তা জনপ্রিয়তার স্বপ্নটা সফল হল, খেয়াল হল না কিছু টাকা পয়সা করার কথাটা। যে যা দেয় যখন যা পায় তাই নিয়ে খুশি হয়ে আসর মাতিয়ে বেড়াতে লাগল দুর্ভিক্ষের কথায়, চাষির দুঃখে।

এমনি রাজেন দাসের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়েছে একজন। হরিখালির নরহরি। শিষ্য সে হলেও হতে পারত রাজেন দাসের, সবে সে প্রৌঢ় বয়সে পা দিয়েছে, কিন্তু শিষ্য সে নয়। গুরু তার কালিগঞ্জের ভূতনাথকেও বলা যায়, গাংপোতামার ভূষণকে বললেও অন্যায় হবে না, আটোনার বিভূতির সঙ্গেও নাকি তাকে দেখা গেছে দু-একবছর।

বাপের ঠিক নাই, গুরুর ঠিক থাকে ?

রাজেন বলে দাওয়ায় সমাগত বন্ধু, ভক্ত আর শিষ্যদের। বলে ছড়া কেটে দেয় ছ-আটলাইন বেঠিক বাপের ছেলের কেন বারবার গুরু ধরে গুরু ছাড়ার ব্যারাম হয়, তারই ব্যাখ্যায়। অনায়াসে

গড়গড় করে ছড়া বলে যায় রসালো এবং ঝাঁঝালো, দ্রুততালের সুর আর ছন্দ ঠিক রেখে, শেষ দু লাইন দুলে দুলে রয়ে রয়ে রসায় :

যখনই বলে গুরুকে বাপ
তখনই ভাবে কে মোর বাপ !

গাইছে কিন্তু বেশ, পুরানো ভক্ত শশী বলে বাপঘটিত গুরুমারা রসিকতার রসটা মরে এলে, বেশ একটু তোলপাড় করছে। বড়ো ছেলেটা শুনে এল সেদিন হাটতলার পয়লা বোশেখের সভাটায়—সুতোকলের লোকেরা করেছিল। বলল কী যে, বেশ গাইছে। তেজে গাইছে। জোরদার গান, বলছে নাকি যে ফের মন্বন্তর এলে কেউ মোরো না, কাঁদাকাটা কোরো না, ফ্যান চেয়ো না, কদম কদম বাড়িয়ে গিয়ে যার গুদামে চাল আছে তাকে গাছের ডালে ফাঁসি দিয়ে—

রসকষ নেই, বাজে ! সজনী বলে। তার শীর্ণ মুখে বার্ধ্যক্যের ছাপ পড়বার আগে নেমে এসেছে রোগের মরণের আবির্ভাব ঘোষণার মতো কালিমা। ধুঁকে ধুঁকে সে বলে, আমি শুনে এয়েছি পরশু। সদর থেকে ফিরছি সাঁঝের বেলা, মামলাটার তারিখ ছিল, তা দিনভর টালবাহানা করে শুনানি হল কচু, ফের তারিখ পড়ল সাতাশে, হাকিমগুলো মরে না ? ধলাঘাটে নেমেছি ফেরি ইস্টিমার থেকে সাঁঝ পেরিয়ে, ভাবছি যে তিন কোশ পাড়ি দেব না রাতটা কাটিয়ে দেব মাথা গুঁজে হেথা হোথা যেথা পারি, দেখি যে লোকে লোকারণ্য ঘাটের পাশে গুয়ারবাগান মাঠটা। কী ব্যাপার ? না, নরহরির কবিগান। বাইরে চাঁদ অস্ত যাওয়া তক, চারটে ঢোলক, দুটো ব্যায়লা, একটা বাঁশি, সাগরেদ বুঝি জন আষ্টেক— গাইলে বেশ। তা রসকষ নেই। শুধু ওই এক কথা, যে মরে সে মরে, তার পাত্তা মেলে না, চুপচাপ মরা পাপ। মোরো না, মারো ! যে মারতে চায় তোমায়, তুমি তাকে মারো !

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল সজনী, রোগ যন্ত্রণা দুর্বলতা সব ভুলে যেন গায়ন শুরু করে দিয়েছে। চারিদিক চেয়ে সে লজ্জিত হয়ে থেমে যায়।

গোঁয়ার।—অসন্তুষ্ট রাজেন বলে, গোঁয়ার গোবিন্দ। গায়নের বোঝে ছাই। এ তো বাবু বক্তিমে নয়, হইহই রইরই করে গালগলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে গেলেই হল ! এ রসের ব্যাপার।

তবু ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বুকটা। মনে মনে সে ভালো করেই জানে, দশজনে যা চায় তাই আসল, আর সব মিছে। তার ভালো বোঝা মন্দ বোঝায় কিছু আসে যায় না। চালার জীর্ণ টিনে এক ঝাঁক পাখি উড়ে এসে বসে, নখের আঁচড়ের সঙ্গে কিচির মিচির আওয়াজ তুলে ঘরের বিষণ্ণ আবহাওয়া মুখরিত করার চেষ্টাই যেন শুরু করে দেয়। হঠাৎ উড়ে যায় কোথায়। ঘরে বসে সে কি বুঝে আসেনি শুনতে পায় না অসংখ্য মানুষের অস্ফুট গুঞ্জন, চিরদিন কি সহজে বুঝে আসেনি সে-ভাষা ? কোথা থেকে কী নতুন মানে আসতে পারে তার দেশের লোকের প্রাণের ভাষায় সে যার মানে বুঝতে পারে না ?

কদমপুরে বায়না আছে কাল। রাজেন বলে আচমকা।

কী ধরবে ? আমোদ শুধায় সাগ্রহে।

ভাবছি কী, রাজেন যেন পরামর্শ চায় মেয়ের কাছে, মন্বন্তরের পুরাণ গায়নটা ধরি। টাকা সের চাল হয়েছে, উপোস শুরু হয়েছে, ফের দুর্ভিক্ষ লাগবে বলছে সবাই ! দুটো চারটে কথা অদলবদল করে নিলে লাগসই হবে মনে করি—নাকি ?

আমোদ উৎসাহ বোধ করে। দীপ জেলে টিনের পুরানো বাক্সোটি খোলে। খাতার কাগজে বাক্সোটি ঠাসা। রাজেন দাসের সারা জীবনের গানের ভাণ্ডার—জীর্ণ হয়ে হয়ে ছিঁড়ে গলে যাবার উপক্রম করেছে, কিছু কাগজ পোকায় কেটে নষ্ট করে দিয়েছে।

হাতে তৈরি মোটা হলদে কাগজের খাতায় মন্বন্তরের গানের খসড়া রাজেনের হাতের গোটা গোটা হরফে লেখা। এটা অবলম্বন করে গান চলে, আসরে গাইতে গাইতে আসে অনেক স্বতঃস্ফূর্ত

কথা, অনেক নতুন মিল নতুন পদ—সেইখানেই বাহাদুরি কবি-গায়কের। আমোদ পড়ে পড়ে শোনায়, মাথা নেড়ে নেড়ে রাজেন শোনে মশগুল হয়ে, তাকে ঘিরে সত্য হয়ে উঠতে থাকে বিরাট জনসমাবেশ, অদলবদল নতুন কথা আর পদযোজনা চলতে থাকে মনের মধ্যে, গত দুর্ভিক্ষের এই মর্মান্তিক রূপ আজকের শ্রোতাদের সামনে ধরার মোট কৌশলটা ঠিক হয়ে যায়। নতুন একটি প্রস্তাবনা জুড়ে দেবে। তাতে থাকবে আবার দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের ছায়াপাতের কথা। তারপর এ গানে যা কিছু ঘটেছে বলে বর্ণনা আছে সে সব ঘটবে বলে সামনে ধরা। লাখ মানুষ কীভাবে মরছে সে বর্ণনা আছে এ গানে, তাকে বদল করে লাখ মানুষ কীভাবে মরতে যাচ্ছে সেই বর্ণনায় পরিণত করা। হৃদয় মুচড়ে যাবে মানুষের। আসর কাঁদবে !

চোখ জ্বলজ্বল করে রাজেনের, উৎসাহে সে সিধে হয়ে বসে।

আসর কিন্তু কাঁদে না। মন দিয়ে শোনে। শুধু শোনে।

রাজেনের নামে পাঁচ ক্রোশ দূরের গাঁ থেকে লোকে এসেছে কবিগান শুনতে, কদমপুরের হাইস্কুলের লাগাও মাঠ ভরে গিয়েছে। এখনও গলার যে জোর আছে রাজেনের, আসরের শেষ প্রান্তের লোকটিও শুনতে পাচ্ছে তার প্রতিটি কথা। শোনার যে অসীম আগ্রহ নিয়ে মানুষ আসে তা যেন আশীর্বাদের মতো, গোড়াতে অল্পেই জমে যায় আসর—নিজের আগ্রহ আর প্রত্যাশা দিয়েই নিজেদের মুগ্ধ করে ফেলে শ্রোতারা। প্রথমে জমজমাট হয়ে উঠেছিল অসহায় মানুষেব নিরুপায় মরণের সকরুণ ভূমিকা আর মানুষরূপী দানবের খেলার ছলে সেই মাবণযজ্ঞ আরম্ভের বর্ণনা, সুরে ও কথার বাঁধুনিতে আরও মুগ্ধ করেছিল সমবেত হৃদয়মন, সভা গমগম করছিল ঔৎসুক্যে, নড়ে চড়ে ভালো করে জেঁকে বসেছিল সবাই। খুশি হয়েছিল রাজেন, পুরোমাত্রায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল, এ তার চেনা লক্ষণ। আসরকে সে হাতের মুঠোয় পেয়েছে। এখন খুশিমতো হাসাতে কাঁদাতে যা খুশি করতে পারে। সভার এই ঘন দানাবাঁধা ঔৎসুক্য আরও নিবিড়ভাবে এ রস পাবার জন্য, যার স্বাদ সে দিয়েছে।

কিন্তু কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায় হিসাবনিকাশ, ধীরে ধীরে বিগড়ে যেতে থাকে সভার মতিগতি। অস্থিরতা বাড়ে, অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে মানুষ, যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে রাজেনের মর্মান্তিক বর্ণনা। আধবুড়ো একজন উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ, মুখে তার খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি, বিস্ফারিত চোখ, সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপছে। তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে সে বলে, রাজেন দাস ! বলি ও রাজেন দাস ! তা তো বুঝলাম, সর্বনাশ তো হচ্ছে, কী করি তার উপায় বলো ! বাঁচি কীসে বাতলে দাও !

এ এক হিসাবে জয় রাজেনের তার শক্তির পরিচয়। কিন্তু এ তো চায়নি রাজেন দাস। মানুষকে আবেগে পাগল করার শক্তি তার চিরদিনই আছে—অন্য কবিওয়ালারও কমবেশি আছে। তাতেই তো রাজেন দাসের আসল সার্থকতা নয়। আবেগে পাগল হবে, হৃদয়মন ভরেও যাবে, তবে না যথার্থ আসর জমল। এ আসরের তৃপ্তি নেই যা চায় তা পায়নি আসরের লোক, তাদের প্রাণ ভরেনি। আরও কিছু চায় তারা রাজেন দাসের কাছে। কী চায় ?

হইচই ওঠে চারিদিকে। কেউ বলে হাঁ হাঁ, কেউ বলে, বসে পড়ো, বসে পড়ো। ধীরে ধীরে যেন সংবিৎ ফিরে পেয়ে এদিক ওদিক তাকায় লোকটি, তারপর বসে পড়ে। রাজেনের মনে পড়ে তার ঘরের দাওয়ায় পুরানো ভক্ত শশীর ব্যবহারের কথা। নরহরির গায়নের কথা বলতে সেও এমনই আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ যেন চেতন ফেরায় এদিক ওদিক চাইতে চাইতে লজ্জা পেয়ে এমনই ভাবে বসে পড়েছিল।

আসর আর তেমন জমে না। যে জমাবে আসর প্রাণের ছোঁয়াচ দিয়ে তার প্রাণেই উদ্‌বেগের আলোড়ন।

সকালে ম্লান মুখে বাড়ি ফেরে রাজেন, জ্বরের রোগীর মতো চেহারা করে। একরাত্রে পায়ের তলা থেকে তার যেন মাটি সরে গেছে। অসম্মান করেনি কেউ, তার কবিত্ব শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েই আছে চারিদিক, আবার তায় গায়ন থাকলে এমনই দূর থেকে লোক এসে ভিড় করবে আসরে, তবু বিস্বাদ হয়ে গেছে জীবন রাজেনের। চরম পরাজয়ে হিম হয়ে গেছে বুক।

ভেবো না বাবা, মনে কষ্ট কোরো না। নতুন গান বাঁধ।

কী গান বাঁধব ?

নরহরিটরি পারে তোমার সাথে ? অন্যভাবে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আমোদ, ভারী খেমতা ! করুক যত পারে শত্তুরতা, নিন্দে করে বেড়াক। তোমার কাছে কলকে পেতে দেরি আছে। নতুন গান বাঁধো—

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিঁচড়ে ওঠে রাজেন, নতুন গান বাঁধো ! নতুন গান বাঁধো ! এ তোর ভাত বেনুন রাঁধা কিনা, বাধলেই হল। ভেতর থেকে গান না এলে বাঁধব কী ?

বোবা বউ বিছানা নিয়েছে ক-বছর, মেয়ে ছাড়া গায়ের ঝাল ঝাড়বার আর কেউ নেই। সেই কবে অতল দয়ার রূপে প্রেম এসেছিল কবির খেয়ালে, নটবরের বোবা মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল রাজেন, দুটি ছেলে দুটি মেয়ের সংসার। বড়ো ছেলে কিছু লেখাপড়া শিখে চাকরি করছে বিদেশে, খবর করে না। আরেক ছেলে গোল্লায় গেছে। এক মেয়ে গঞ্জনা খেয়ে মরছে শ্বশুরবাড়ি। এমন দেশজোড়া নাম, তার কবি বাপের, সে তুলনায় অনেক প্রত্যাশা করে কিছুই তারা পেল না। আরেক মেয়ে ঘাড়ে ঝুলছে। দু বিঘে জমিজমা হল না, দুটো পয়সা জমল না, পুরানো জীর্ণ রয়ে গেল ঘরবাড়ি। কী হল ? কী হল রাজেন দাসের জীবনে ? কিছুই সে করতে পারল না কোনোদিকে।

তেমন জমেনি শুনলাম মদনপুরে ? শশী বলে আপশোশ জানিয়ে। শুনে বুক পুড়ে যায় রাজেনের।

বয়স তো হল।—আপশোশ জানিয়ে বলে সজনী।

রাজেন উঠে যায়।

সেদিন খবর আসে, গোলার হাটে নরহরির গান। কদিন ছটফট করছিল রাজেন, খবর শুনে গুম খেয়ে যায়। গানের খসড়ার টিনের তোরঙ্গটি খুলে চুপচাপ বসে থাকে বেলা দুপুর তক। তারপর হঠাৎ উঠে তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে নেয়, ফোকলা মুখে পান চিবুতে চিবুতে জামা গায়ে দিয়ে পায়ে আঁটতে থাকে ক্যাম্বিসের জুতো।

বোবা বউ হাতের ইশারায় কাছে ডাকে, ইশারায় কী যেন বলে।

আচমকা হাসি ভাঙে রাজেনের মুখে।

আনব গো আনব। তোমার তামাক পাতা আনব।

যাচ্ছ কোথা ? আমোদ শুধায়।

যাচ্ছি কোথা ? নরহরির গান শুনতে যাচ্ছি।

তুমি যেচে যাচ্ছ ওর আসরে !

শুনে আসি। দেখে আসি।

নরহরির আসরে আচমকা রাজেনের আবির্ভাব সত্যই অঘটন, চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। সাধারণ একজন শ্রোতার মতোই দশজনের মধ্যে বসে পড়তে যাচ্ছিল, কর্তা ব্যক্তি কজন এগিয়ে এসে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে সম্মানের স্থানে বসিয়ে দিল। একজন তখন হারমনিয়মে সাধারণ গান ধরেছে।

নরহরি মাটি পর্যন্ত মাথা নামিয়ে ভূতপূর্ব গুরুকে প্রণাম জানায়, কিন্তু কাছে আসে না, কথা বলে না। গুরুশিষ্য সম্পর্ক হলেও তারা প্রতিদ্বন্দ্বী। আসরে আসরে তারা পরস্পরের নামে টিটকারি

দেয়, পরস্পরকে ছোটো করে। তবে গুরু গুরুই, গাল দিতে হলেও তাকে প্রণাম জানিয়েই গাল দিতে হবে !

গানের শুরুতে নরহরি প্রণাম জানাল ছড়ায়—

হাতে ধরে গান শেখালে,
গুরু তুমি বাপ,
গুরুমারা বিদ্যা দেখে
দিয়ো না অভিশাপ !
দুটি পায়ে প্রণাম জানাই,
যে গুরু সে বাপ।

কবিগানের মন্থরগতি, ধীরে ধীরে নানা আঁকাবাঁকা পথে নানা বিপথে নানা বাহুল্য বৈচিত্র্য সংগ্রহ করতে করতে এগিয়ে চলে, আস্তে আস্তে আসর জমে। নরহরি প্রথমে আরম্ভ করে দুর্দিন ঘনিয়ে আসার গান—মনে মনে রাজেন বলে, চোর ! গুরুমারা বিদ্যাই শিখেছ বটে তুমি ! দুঃখের দিনের ছবি ভয়াবহ হয়ে উঠতে না উঠতে পাশ কাটিয়ে নরহরি গায় : কোমর বাঁধো ভাই !

একটু থতোমতো খেয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে রাজেন।

করুণ হয়ে ওঠে নরহরির মরণের গান, হৃদয়ে মোচড় দেয় তার রসালো, ঝাঁঝালো পদগুলি, কিন্তু চোখে জল আনে না, কাঁদায় না। অসহায় হতাশায় ফেটে যাবার উপক্রম করে না বুক। ক্রোধে, ক্ষোভে তপ্ত হয়ে ওঠে নিশ্বাস, হাতগুলি যেন এগিয়ে যেতে চায় নরহরির ডাকেই সায় দিয়ে শিশুখেকো মেয়েখেকো মানুষখেকো রাক্ষসগুলির টুঁটি ধরে টেনে এনে ফাঁসি লটকে দিতে--

ছাড়ো মিছে আশ
রাজার সেপাই দেয় কীরে ভাই
(মুখে) তুলে ভাতের গ্রাস

বারংবার উন্মাদনা ফেটে পড়ে সভায়। মুখ টানটান। চোখে চোখে আগুনেব ঝিলিক।

সহকারীকে সুর ধরিয়ে দম নিতে বসতে যাবে নরহরি, রাজেন তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে। বলে, নরহরি তুই মোর গুরু ! তোকে প্রণাম করি ! তুই মোর গুরু !

হাত বাজিয়ে সে পা ছুঁতে যায় নরহরির। নরহরি ঠেকিয়ে রাখে। ওরে বাপ রে, অপরাধ হবে, পা ছুঁয়ো না বাপ। মরে যাব !

তবে বল মোর মেয়াকে লিবি ! তোকে ছাড়া আর কারও হাতে মেয়া দেব না !

দু আঙুল কানে ঢুকিয়ে নরহরি বলে, বোলো না বাপ। শুনতে নাই তোমার মেয়া আমাব বুন !

নব আলপনা

শ্রীমতী ছিপছিপে কিন্তু কী সুকোমল। রোগা থেকেছে তবু চর্বি জমিয়েছে। দেহচর্চার বিশেষ প্রতিভায় এটা সম্ভব। খাদ্য কন্ট্রোলের বিশেষ কায়দায় না মুটিয়েও মেদবহুলতায় স্নিগ্ধ লাবণ্য ধরে রাখা যায়। কাজটা, কঠিন সাধনাসাপেক্ষ হলেও, থিয়োরিটা সোজা। যে মোটায় তার শরীরে শুধু চর্বিই গাদা হয় না, হাড়মাংসও বাড়ে। সুতরাং হাড় সবু রেখে মাংস কম বাড়িয়ে কিঞ্চিৎ চর্বির সমাবেশ ঘটিয়ে একটা সামঞ্জস্য সাধন করতে পারলে রোগা ছিপছিপে থেকেও সিঁটকে যাবার দরকার হয় না, শুকনো দেখাবার কারণ ঘটে না, স্নিগ্ধ মোলায়েম লাবণ্য বজায় থাকে।

তবে, ঠিকমতো খাদ্য চাই, বাছাবাছা বিশেষ খাদ্য, যা সময়মতো পরিমাণমতো খেলে হাড় মাস চর্বি কোনোটাই যে প্রায় শুধু বাড়বে না তা নয়, কমবেও না এবং তিনেরই পরিমাণগত সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ থাকবে। নইলে রোগা হবে, কর্কশ দেখাবে। অথবা ঠাম হারাবে।

যেমন চুণো আর শ্রীমতীর মেজোবউদি। চলতে ফিরতে ললিতার সর্বাঙ্গে লাবণ্য দোল খায় আর সেই গর্বে খেঁটে পড়া ওর চলনে মেয়ে মাত্রের গা জ্বলে। শ্রীমতীর মেজদাও নির্লজ্জের মতো ওকে নিয়ে আত্মহারা !

চুণো পাড়ার বস্তির মেয়ে। হ্যাঁ, শ্রীমতীদের পাড়াতেও বস্তি আছে। চুণো রোগা, ক্যাংটা। নিছক খেতে না পেয়ে রোগা, ইচ্ছে করে কম খেয়ে নয়। তাই দেহের গঠনের লাইন যদিও তার অদ্ভুত, শ্রীমতীর লাইনগুলিকেও হার মানাতে পারে, ধুলোমাখা ছিবড়ের মলিন বস্তির দারিদ্র্যজাত রুক্ষতা সব নষ্ট করে দিয়েছে !

শ্রীমতী ভাবে, লাবণ্য দিয়ে ও মেয়েটা করবে কী, কী কাজে লাগবে !

চুণোর স্বপ্ন অদ্ভুত, এলোমেলো কিন্তু জমজমাট—ভিড়ের মতো জমজমাট, রাস্তার ভিড়, পূজা মণ্ডপের ভিড়, মহরমের ভিড়, মেলার ভিড়, শোভাযাত্রার ভিড়। চলে ফেরে জমাট বাঁধে তবু তারই মধ্যে উলটে-পালটে ভাঙে ও গড়ে ইতস্তত সঞ্চালিত হয়। গোবর মাটিতে নিকানো মেঝে শুকিয়ে শুকিয়ে এসে যখন ছোটো বড়ো অনেক ভাগ হয়ে যায় শুকনো ভিজে মেটে রঙের ছোপে, ন্যাতার টানে আঁকা রেখাগুলির সাথে যেন তৈরি হয় ক-টি সাদামাটা ছবি, কুঞ্জর ঝাঁকড়া চুলের নীচে চিবুকটা ব্যাতালো হয়ে মনে হয় যেন চোখ টিপে তাকে তামাশা করে ভ্যাংচাচ্ছে—মজা লাগতে লাগতে চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ঘিরে ধরে আসে অসংখ্য অসম্পূর্ণ মূর্তি। কুমোরবাড়ির পোড়ানো মাটির পুতুলে আসল মানুষ দেখার অভ্যাস চুণোর। মূর্তি প্রতিমূর্তি ছাড়া সে স্বপ্ন ভাবতে পারে না।

বাজারের বড়ো মোড়টার পাশে কয়লার টুকরি সাজিয়ে বস্তির মেয়েরা বসে থাকে। চুণো গিরির পাশে তার গা ঘেঁষে বসে। উৎসুক হয়ে প্রতীক্ষা করে চশমা পরা বেঁটে বাবুটা কখন এসে দাম না শুধিয়েই থলে বাড়িয়ে বলবে, চার ঝুড়িই ঢেলে দে। আজ কত নিবি ?

দু-চারআনা বেশি দিয়েই চলে যায়। লোকটা একনম্বর বোকা আর একনম্বর বজ্জাত। চুণো জানে, বস্তির কোনো মেয়ের কাছেই এদের চালচলন অজানা থাকে না। মনটা তার ভিজিয়ে রাখছে, দরকার মতো ইশারা করবে। মনে মনে লোকটা ভাবছে সে কত যে ভালো ভাববে বাবুকে, গলে জল হয়ে থাকবে বঁড়শি ছাড়া আলগা টোপ গিলে গিলেই।

চড়া দাম হয়েছে কয়লার টুকরির, ভারী চড়া। আট-নআনা টুকরি— ওপরের টুকরিতে দুটি কয়লা বেশি আছে, এক টুকরি যে কিনবে তার ওটা মিলবে না। তলার কম কয়লায় টুকরি একটা নিতে হবে। অনেকেই কয়লা কিনতে চায়, দর শুধিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হতাশভাবে, চলে যেতে পারে না শুধু এই জন্য যে ঘরে এক টুকরো কয়লা নেই, আজ যদি বা চলে যায় কোনোরকমে, কাল ভোরে আঁচ পড়বে না উনানে, ভাত চড়বে না।

কিনতেও পারে না, চলে যেতেও পারে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে মনে হিসাব করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই দুমুখো সমস্যার হিসাব—আট আনার কয়লায় যে দুবেলার বেশি তিনবেলা চলবে না অথচ এদিকে আবার, কয়লা ছাড়া যে ভাত সিদ্ধ হবে না, কয়লা না কিনলে আটআনা দিয়েই ! মীমাংসা কী ?

আড়তদার নন্দীবাবু বলেছে : লেবে লেবে, আটআনা কি বারোআনা দিয়ে লেবে ! শহরে কয়লা নেই। গলিতে ঢুকে বাঁয়ে দরজা-বন্ধ আড়ত। পিছনের খিড়কি দিয়ে খুঁজি পথে টুকরি ভরে আনে তারা, উঠানে বসে কয়লার বড়ো চাপ ভেঙে টুকরো করে। খুঁজি পথে তাদের আনাগোনা দেখা যায়, বাবুরা দ্যাখে, পুলিশ দ্যাখে, সবাই দ্যাখে !

সামনে টুকরি সাজিয়ে, ক্রেতা যে আসছে খেয়াল রেখে চুণো স্বপ্ন দ্যাখে সামনের ওই খাবারের দোকান, দুটো দোকান বাদে মুড়িমুড়কি গুড় বাতাসার দোকান, পাশ দিয়ে বস্তিতে ঢোকার গলি। ঘিঞ্জি করা ঘরগুলির মধ্যে তাদের একখানি ঘর, আবছা আঁধারে চুণো একলাটি বসে। তার মা গেছে ঝিয়ের কাজে, ভাই গেছে কারখানায়। কুঞ্জ যদি আসে কাগজের ঠোঙায় তেলেভাজা চপ আর পাঁপর নিয়ে, নোনতা বুটি বিস্কুট নিয়ে। ঘরে ঘরে গাদা মানুষ, দাওয়ায় উঠানে বসে দাঁড়িয়ে অনেক মানুষ কিন্তু না, কুঞ্জকে কেউ দ্যাখেনি। সবার চোখের সামনে দিয়ে কুঞ্জ ঘরে ঢুকল তবু কেউ দ্যাখেনি, দেখেছে তবু দ্যাখেনি, কী যেন অবাক রকম ম্যাজিক। একহাতে ঠোঙাটা তুলে দিতে দিতে আরেক হাতে যদি কুঞ্জ ধরে তাকে, সে যদি বলে, থামো, আগে খেয়ে নিই, বড্ড আমার খিদে, ঘর আর দাওয়ায় মানুষ যদি ভান করে যে কেউ আসেনি চুণোর ঘরে, শুধু কুঞ্জ এসেছে খাবার নিয়ে, আহা মেয়েটা খাবার খাক কুঞ্জের দেওয়া খাবার খাক ভালো মানুষ যদি হয়ে যায় সবাই গিরির মা, নকুড়ের বউ, আন্দি, মালতী, সতীশ, ভূষণেরা, চুণোর খিদে পেয়েছে বলে মমতায় চোখ মুখ কান বন্ধ রাখে --

না, চুণোর স্বপ্ন দেখা হয় না সব ভিড় হয়ে যায়। কোথায় যায় কুঞ্জ আর তার খাবারের ঠোঙা, ফাঁকা ঘরের নিরালা অবসর, চেঁচামেচি বকাবকি মারপিট শুরু হয়ে যায় তার জাগ্রত স্বপ্নে—সারা শরীরটা মেলে ধরে সবার চোখের সামনে স্নান পর্যন্ত যাকে করতে হয়, কথা ঠেলাঠেলি ঝগড়া করে সে ভাববে কী করে নিভৃত অন্তরালের কথা ! যা নিরাপদ, দু দণ্ড টেকসই !

মিথ্যা স্বপ্ন ভেঙে যায়, শুরু হয় চুণোর আসল স্বপ্ন। ওই হাটবাজার শাসন গালাগালি হট্টগোল জড়ানো কল্পনাই যেন তার জমে, নিত্যকার ঘটনাই যাত্রা থিয়েটারের মতো রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে। কুঞ্জ এসেছে বইকী তার কাছে, মস্ত এক ঠোঙা খাবার নিয়েই এসেছে। সকলে দেখেছে, জেনেছে— হইচই করে উঠেছে। কী এসে যায় তাতে ? কুঞ্জর গায়ে জোর নেই ! কুঞ্জ আড়াল করে দাঁড়িয়েছে তাকে। কুঞ্জ দাঁতে দাঁত ঘষছে রাগে, ভাইকে ঠেলে দিয়েছে উঠোনের নর্দমায়, এক ধাক্কায় হটিয়ে দিয়েছে মাকে। চকচকে ছোরা বার করে কুঞ্জ বলছে, আয় শালা, আয় শালি, কে আছিস আয় !

চুণো হাত ধরেছে কুঞ্জর। চকচকে ছোরা-ধরা হাতটা ধরে সামলাবার চেষ্টা করছে কুঞ্জকে !

উঃ ! যদি হত !

চশমা-পরা বেঁটে বাবুটি মন্থর পদে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়।

কীরে, কয়লা দিবি নাকি ?

নে যাও।

আজ থলি আনতে ভুলে গেলাম। এক কাজ করবি, পৌঁছে দিয়ে আসবি ? কাছেই বাড়ি, বেশি দুর নয়। চুণো নির্বোধের মতো চেয়ে থাকে। মনে মনে বলে, বাড়ির মানুষ বুঝি তোমার কোথাও গেছে আজ, খালি বাড়ি পড়ে আছে।

পয়সা বেশি নিস না হয় ! কিন্তু চুণো তো উঠতে পারবে না আজ এখান থেকে। আরেক দিন দরকার হলে পৌঁছে দিয়ে আসবে, আজ নয়।

একটা ছেঁড়া বস্তায় বেঁধে দি ?

থাক, আজ কয়লা নেব না।

আকাশে তখন মেঘের ঘনঘটা।

নটুক যখন গাড়ি চাপা পড়ল সরকারি রেশন শপের সামনে গুরুভার গাড়িটা তরুণ বটগাছটার তলায় শিবলিঙ্গ ভেঙে ছিটকে ফেলে দুশো গজ দূরে সামনে মানুষের বাধা পেয়ে বাঁয়ে মসজিদের রেলিং ভেঙে থামল। ভিড় বলা যায় না মানুষের বাধাকে, পঁচিশ-ত্রিশজনের বেশি ছিল না।

তাকেই দুর্ভেদ্য বলে মেনে না নিলে অনায়াসে বাধা ছিন্নভিন্ন করে বেরিয়ে যেতে পারত গাড়িটা। পরে কী হত সে পরের কথা। তবে স্টিয়ারিং ছিল কালো আব্বাসের হাতে, মার্কিন সোলজারটার হাতে ছিল স্টেনগান। আব্বাস কালো মানুষের দেয়াল ভেদ করে ট্রাক চালাতে শেখেনি। জনতা আগুন দেয় গাড়িতে, ধরে নামায় ইউনিফর্ম পরা ঢ্যাঙা সাদা মার্কিনি সৈনিক আর উর্দিপরা আব্বাসকে।

আব্বাস খাঁ নীরবে বিনা প্রতিবাদে নিজেকে জনতার হাতে সঁপে দেয়, চোখের পলকে মাথার টুপি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় ছোট্ট জনতার পায়ের নীচে আর অন্যজন উগ্র মার্কিনি স্ল্যাং আউড়ে ভড়কে দেবার চেষ্টা করে ভীরু নেটিভগুলোকে। বড়ো একটা কয়লার চাপ এসে লেগে মাথাটা একটু ছেঁচে দেয়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে (তেতলা ও একতলা মোটা ভারী ভাড়ায় আজকালের মধ্যে বেদখল হয়েছে শ্রীমতীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও) শ্রীমতী এ দৃশ্য দ্যাখে, ঘটনার প্রায় গা-ঘেঁষা ডাইনের গলিপথটায় কণ্ঠায় বসানো ডাস্টবিনের ধারে হোটেলখানার ছাইগাদা ঘেঁটে ঘেঁটে পোড়া কয়লা খোঁজা বন্ধ রেখে চুণো দ্যাখে সোজা চোখের সামনে।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপে শ্রীমতী, কোমল হাতের তালুতে, রেলিংটা আগুনের মতো গরম লাগে এত জোরে সে আঁকড়ে ধরে রেলিংটা। চুণো শুধু চেয়ে থাকে বিস্ফারিত চোখে।

হোটেলখানায় সাজানো শিককাবাব, পাশে রুটির স্তূপ, একটা ছোকরা পেঁয়াজ কেটে কুচো করে জমিয়েছে মাটিতে, মাংসের গরম ডেকচি থেকে উঠছে সাদা বাষ্প। হইচই হাঙ্গামা শুরু হয়েছে, খাবলা মারা যায় না মাংস রুটিতে ?

নটুক চুণোর ভাই। মায়ের পেটের ভাই, তবে এক বাপের ব্যাটা কিনা তা নিয়ে ঘোঁট আছে বস্তিতে। নটুক ফরসা, প্রায় মেমের বাচ্চার মতো সাদা। আঁতুরে তাকে প্রথম কাঁদন কাঁদাতে গিয়ে চুণোর পিসি এক আছাড়ে একটা পা তার ভেঙে দিয়েছিল। আরেক আছাড়ে কী হত কে জানে। বিয়োনোর ব্যথা-বেদনা ভুলে নটুকের মা সেঁক-তাপের আগুনের মালসাটা ছুঁড়ে দিয়েছিল পিসির গায়ে।

জন্ম-কাঁদনের আছাড়ে খোঁড়া না হলে হয়তো আজ গাড়ি চাপা পড়ত না নটুক।

চুণো বড়ো ভালোবেসেছিল ভাইটাকে। রাঙা সুন্দর ভাই, তাতে খোঁড়া অসহায়। চাপা যে পড়েছে সে তারই ভাই চুণো এটা টের পেতে পেতে মিলিটারি এসে গেছে। একদল মার্কিন সৈন্য,

দীর্ঘ উদ্ধত, তকতকে পোশাক, চকচকে বুট, বেঁটে বেঁটে বন্দুক। সঙ্গে আরেক লরি গুর্খা। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আগেই, দুয়ারে দুয়ারে আগল পড়েছিল, রাস্তাও সাফ হয়ে যাচ্ছিল মিলিটারি আবির্ভাবের পর দেখতে দেখতে—সামরিক শক্তির প্রতি, বজ্রধারীদের প্রতি নিরস্ত্র ক্ষুব্ধ মানুষের কত বড়ো সম্মান দেখানো ! শিবমন্দির চূর্ণ করা, মসজিদেব দেযাল ভাঙা কেউ ধরেনি, অকারণে একটা জীবননাশের বিনিময়ে শুধু অজ্ঞান করেছে হত্যাকারীকে আব পুড়িয়েছে একটা গাড়ি—তাদেবই দেশের সম্পত্তি। শুধু এইটুকু, সামান্য বচসায় হাতাহাতি থেকে ঘবে আগুন লাগে, তার তুলনায় কত সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার। তবু সকলে তাদের পথ ছেড়ে চলাফেরার অধিকার খর্ব কবে স্বেচ্ছায় মিলিটারিকে সম্মান দেখিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতেই চেষ্টা করেছে। কেন যে এই অনুকূল সংবর্ধনা, এই প্রত্যক্ষ সক্রিয় শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে মন ওঠে না সৈন্যের ! পলায়নপরদের নিয়েই তাণ্ডব সৃষ্টি না কবে, ফটফট গুলি ছুড়ে কয়েকজনকে ছিটকে ছিটকে রাস্তায না শুইয়ে দিয়ে, দোকানে বাড়িতে দবজা ভেঙে ঢুকে লণ্ডভণ্ড না করে, যাকে সামনে পায় তাকেই আথালিপাথালি না মেরে সাধ মেটে না ! ওরা কী জানে যে ওই সম্মান দেখানো টিটকারি, পালানোটা ব্যঙ্গ ? জানে কি যে রাইফেল স্টেনগানধাবী তাদের মর্যাদাই যদি এরা জানত, সম্মানবোধ থাকত, ট্রাক বোঝাই হয়ে তারা আসবে জেনেও তা হলে কখনও ট্রাক পুড়িয়ে দিত না। এতদিনেও কি নিবস্ত্র জনতাব চালচলন আচাব ব্যবহারের মানে স্পষ্ট হতে বাকি আছে ! ছত্রভঙ্গ হয়ে সবাব ছুটে পালানো তাদের ভযে নয, যাদের হাত খালি তাদের মধ্যে যে উৎকট তামাশা বোধ আছে, হাস্যকর বীভৎসতা আছে, অস্ত্রধারী তাঁদেবই শোচনীয ভীবুতা আর আতঙ্কের প্রমাণ আছে, সেটা স্পষ্ট কবে তোলাব জন্যই জনতা পালায়। পাগলা কুকুব, খ্যাপা হাতি দেখেও এমনই পালানোর ব্যঙ্গই তারা করে।

তা, এটা চুণোও জানে বোঝে !

বীরপুবুষরা এয়েছে,—রুক্ষ এলোচুল মাথায খোপার মতো প্যাঁচাতে প্যাঁচাতে চেয়ে চুণো মুখ বাঁকিয়ে বলে, মরদরা এয়েছে ! মরে না ব্যাটারা !

বস্তির হিজিবিজি গলিঘুজি দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরে সে এগিয়ে যায় অন্য মোড়েব দিকে, যেখানে রাস্তায় পড়ে আছে নটুকের রক্তাক্ত ছ্যাঁচা দেহটা, মলিন পিচে রক্তেব দাগ, ছিটকানো রক্তের ফোঁট ফোঁট চিহ্ন। আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখতে হয় চুণোকে। খাঁ খাঁ করছে রাতের শ্মশানের মতো মেঘলা সকালের রাজপথ। ভাঙা শিবলিঙ্গের বটগাছটার তলে শুধু কযেকজন সৈন্য পরামর্শ কবছে। লোহালক্কড়ের দোকান বুঝি বন্ধ কবার সময় পায়নি, তারপর বুঝি আর বন্ধ করতেও দেয়নি, তক্তপোশটা দোকানের সামনের দিকে টেনে এনে তারা বসল।

টিপিটিপি বিষ্টি নেমেছে।

বাড়ি যা, অন্ধকার ঘবে সন্তর্পণে কানে কানে কুঞ্জ বলে চুণোকে, এরপর যেতে পারবি নে।

চুণো মাথা নাড়ে, কথা কয় না। মোড়ের মাথায় কুঞ্জর শুখো এবং বিড়িপাতা বেচার ছোটো ঘর, সামনের কপাট বলতে টিনের ঝোলানো ঝাঁপ, ভেতর থেকে টেনে টুনে বন্ধ করেছে। টিনে ফাঁক আছে ছোটো ছোটো তার একটাতে একটা মোটে চোখ রেখে রাস্তায় শোয়া নটুককে দেখা যায়। পাশের এই ঘুপচি জানালাটার পাট একটু ফাঁক করে তাকালে দুচোখেই পড়ে নটুককে, আরও স্পষ্টভাবে। যদিও তাকাতে হয় চোখ একটু বাঁকিয়ে।

কুঞ্জ ভাবে বন্ধ দোকানের জানালা দিয়ে কেউ চুপিচুপি উঁকি মারছে এটা যদি নজরে পড়ে যায় ফাঁকা রাস্তা আর নটুকের দেহটার পাহারায় রত ওদের। যদি দোকান ভেঙে বা পাশের খিড়কির দুযাব ভেঙে ভেতরে আসে চুণো আর অন্য যে মেয়েছেলে আছে বাড়িটার বসবাসের অংশটাতে তাদের গন্ধ পেয়ে ! কুত্তার মতো ওদের নাক, বাতাসে গন্ধ খোঁজে লুটের যোগ্য মেয়েছেলের।

পিঠে হাত রাখে চুণোর, বলে, কী করবি ? বন্ধ করে দে জানলা। ঘর যা বরং।

চুণো আবার মাথা নাড়ে। তার রুক্ষ চুল আলগা বাঁধন খুলে এলিয়ে পড়েছে।

ঘরের আবছা আঁধারেও টের পাওয়া যায় চোখে তার জল নেই, জানালার ফাঁকটুকু দিয়ে যে আলো আসছে, মেঘলা সকালের ম্লান আলো, তাতে জ্বলজ্বল করছে তার দুটি চোখ।

এ ভারী অন্যায় ! ছি !—শ্রীমতী ক্রুদ্ধ স্বরে প্রতিবাদ ঘোষণা করে, মিশনের সঙ্গে বৈঠক চলছে ওদিকে, এদিকে এমন সব কাণ্ড, এমন অত্যাচার !

তারপর সে বলে, যাক গে, মিলিটারি এসে গেছে, এবার যাওয়া যাবে, চল যাই।

সে আর তার সঙ্গীকে নিয়ে মোটরটা যখন সামনে দিয়ে যায়, এক মুহূর্তের জন্য নটুকের দেহটা আড়াল হয়ে যায় চুণোর চোখ থেকে।

ইস ! শ্রীমতী তার সঙ্গীকে বলে নটুককে এক পলক দেখে।

ব্রিজ

শ্রাবণের শেষ বেলা।

যে ট্রেনটি ধীরে ধীরে হাওড়া স্টেশনে ঢুকে থেমে দাঁড়িয়ে সশব্দে বুদ্ধবাষ্প ত্যাগ করল, তার আগমন ভারতের অপর প্রান্ত থেকে। তেরোশো মাইলের বেশি পাড়ি দিয়েছে ঘর্মাক্ত উলঙ্গ কালা মানুষের হাতে পাতা লোহার লাইনে চাকা গড়িয়ে।

দশ ঘণ্টার বেশি লেট। এ রকম হচ্ছে ছেচল্লিশের অব্যবস্থা, অরাজকতায়। এ ট্রেনটির এত বেশি লেট হবার বিশেষ কারণ ছিল। মাঝপথে মধ্যভারতের বিখ্যাত এক শিল্পকেন্দ্র শহরের স্টেশনে গাড়িটা অনেকক্ষণ আটকে ছিল।

সে এক কাণ্ড বটে।

শহরে সাদা সৈন্য লাগিয়ে কুলি বিদ্রোহ দমনের হাঙ্গামা চলছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও কিছু কিছু শুরু হয়েছিল এই সঙ্গে। শহরের প্রান্ত-ঘেঁষা স্টেশন, হাঙ্গামার এলাকা থেকে টাঙাতে প্রায় ঘণ্টাখানেকের পথ। স্টেশনে গোলমাল ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল ডজন খানেক বিদেশি সৈনিক, নিরিবিলি কিঞ্চিৎ মদ্যপান করছিল—স্ত্রীলোক ছাড়াই। আশেপাশে কাছাকাছি সাধারণ লোক, রেলকর্মচারী আর কুলিমজুরের সপরিবারে বসবাস, রেলওয়ে কোয়ার্টারে, ভাড়াটে বাড়িতে, বস্তিতে। সুতরাং স্ত্রীলোক কম ছিল না চারিদিকে, বুজিরোজগারিদের মা বউ মেয়ে বোন। বিদেশি সাদা সৈনিক, এ দেশে মহাপুরুষাধিক। যুদ্ধের সময় রুটির টুকরো দিয়ে তারা দেশি মেয়ে কিনেছে চিরদুর্ভিক্ষের দেশে, তাদের জন্য গোরুছাগল হাঁসমুরগি রসদ সরবরাহের মতো গড়ে উঠেছে উপোসি উচ্ছন্ন গাঁয়ের মেয়ে বউ সরবরাহের ব্যাবসা। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাক, তাদের দাবি তাদেব অধিকারের জের তারা টেনে চলতে চায় সমানে। তারা খাবে নিরামিষ মদ আর শত শত উপভোগ্যা স্ত্রী জাতীয়া জীব আশেপাশে কালা বাপ ভাই স্বামীর আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোবে—এ অসহ্য অন্যায়, নিদারুণ অসঙ্গতি।

অতএব তারা স্ত্রীলোক চেয়েছিল। বেশি নয়, দু-চারজন। একজন হলেও তাদের দশ-বারো জনের চলে যায়—যুদ্ধের সময় অমন অনেকবার তারা চালিয়ে নিয়েছে। তাদের ট্রেইনিং আছে, মত্ত অবস্থাতেও কিউ দেওয়ার নিয়ম মেনে নিজের পালার জন্য ধৈর্য করে অপেক্ষা করতে পারে। দুঃখেব বিষয় মেয়েটা হয়তো মরে যায়। তা দেহ যতক্ষণ পচে গলে না যায়, উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ তা দেহই থাকে। তাজা রক্তে সিঞ্চিত দেহ।

কিন্তু এদিকে ইতিমধ্যে কী যেন হয়েছে এ দেশের অহিংস মানুষের।

নিরস্ত্র বাপভাই স্বামীপুত্রগুলি হয়ে উঠেছে দিগ্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য। সশস্ত্র দেবতাদের পর্যন্ত মেয়েদের গায়ে হাত দিতে দেয় না, বাধা দেয় মরণপণ করে, মরেও !

গাড়িটা গিয়ে পড়েছিল স্টেশনের এই মারামারির মধ্যে ! গাড়ির অর্ধেক যাত্রী ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হাঙ্গামায়। তারপর যথা নিয়মে চলে গ্যাসবোমা ও গুলি। বেশির ভাগ আহত যাত্রী গাড়িতেই এসেছে। কিছু হতাহত পড়ে আছে সেই স্টেশনে অথবা হাসপাতালে।

কলকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর এগিয়ে গিয়ে ট্রেনটির নাগাল ধরেছে। ভোরের দিকের স্টেশন থেকে যাত্রীরা কুড়িয়েছে শুধু গুজব—খানিক বেলায় স্টেশনে পাওয়া গিয়েছে খবরের কাগজ।

জগতে কি শুধু দাঙ্গাহাঙ্গামাই চলছে চারিদিকে ? অথবা সেই মধ্যভারতের স্টেশনের হাঙ্গামাই শূন্যে উড়ে এসে ছড়িয়েছে কলকাতায় !

আহত যাত্রীদের উত্তেজনাই সব চেয়ে কম দেখা যায়। এমনভাবে ক্লিষ্ট হাসি হেসে তারা কথা বলে মাথা নাড়ে যেন বলতে চায়, জগতেব অবস্থা যে কী তারাই তো তার জীবন্ত প্রমাণ। ভিড়ের গাদাগাদি আর অনবরত ঝাঁকুনিতে যাদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট হবার কথা তাদের সহ্যশক্তি যেমন সবচেয়ে বেশি দেখা যায় অভ্যাস আর অভিজ্ঞতার ফলে, একটা হাঙ্গামায় আহত হয়ে এদের সব রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে অবজ্ঞা জন্মে গেছে।

নতুবা শহরের বিবরণ যেমন ভয়ংকর তাতে গাড়ির কামরায কামরায় ভয়ার্ত কলরব শুরু হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু বহুরূপী আতঙ্ক আর কত উত্তেজনা জোগাবে, কত ভীত করবে মানুষকে ? বেশি বাড়াবাড়ি করলে শিশুও চিনে ফেলে ভয়ংকরকে। একটানা রূপান্তর খেলার শামিল হয়ে গেছে, রোগ দুর্ভিক্ষের নিত্যলীলার মতো। অন্তত এ গাড়ির একজন মাঝবয়সি মানুষ তো আর কোনোদিন শঙ্কিত হবে না, স্থায়ী রেখায় কপালের চামড়া ভেঁজে কোনোদিন আলোচনা করবে না দেশের আজ দুর্দিন। তাব দেহযন্ত্রটি বুঝি ট্রেনের সকলেব চেয়ে দুর্বল ছিল, শিশু আব বুড়োদের চেয়েও। শুধু ভিড়েব চাপে গরমে তৃষ্ণায় আর বাতাসের ঘাটতিতে সে শেষ হয়ে গিয়েছে। মরে গিয়েও পড়ে থাকাব স্থান জুটেছে প্রায় লাগেজেরই দুমড়ে মুচড়ে পড়ে থাকার মতো। হাত-পা ছড়িয়ে মরার জায়গারও অভাব !

হাওড়ার নতুন ব্রিজ সে আর দেখবে না। তার সাথি ক্লিষ্ট আবক্ত চোখে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ব্রিজটি দেখে মুহূর্তেব জন্য তার এসেছিল বিস্ময়বণ। হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে মুখ ফিরিয়ে সাথিকে জানালা দিয়ে ব্রিজটি দেখার কথা বলতে গিয়ে প্রচণ্ড আঘাতে ঝাঁকি খেয়ে আধ-নোয়ানো মাথাটা তাব থমকে গিয়েছিল।

ব্রিজ পার হয়ে শহব।

ব্রিজেব ঝকঝকে পেন্ট-মাখা বিরাট কাঠামো থেকে শেষ বেলাব পড়ন্ত বোদ ঠিকরে পড়ছে অসংখ্য চোখে। গুলুব চোখে বিনয়হীন শক্ত বিস্ময়। ধুত্তেরি এটা কী কাণ্ড করেছে ! কী জন্যে কে জানে বাবা ! কত লোক খেটেছে ? ইস আগে যদি শিখত লোহালক্কবের কাজ তো নির্ঘাত এটা তৈরির কাজে লেগে যেত চড়া মজুরিতে। চড়া মজুরি দিত কিনা সেটা জানা নাই বটে। দিত না। উঁহুঁ, দিত না। এ তো পুল বটে একটা, হোক যত মস্ত আর অবাক মতো, আকাশছোঁয়া, আকাশটার মতো চকচকে। সোন নদীর যে পুল হল সেটাও পুল। বলটু এঁটে বলটু এঁটে কী মজুরি মিলেছে ? এ শালার পুল বানাতে পয়সা যদি দুটো বেশি মিলত তো শালার শহরে চড়া দরে ভাত খেতে তা পুষিয়ে যেত হা, পুল বানিয়েছে দ্যাখো !

দ্যাখো, বিমীর চোখ এদিক পর্যন্ত শানায়, চুড়ি ক-টা বেচে এলাম, হাবাতেরা রুপো দিয়ে পুল বানিয়েছে দ্যাখো !

অনাথের আনাড়ি চোখ থেকে ব্রিজের ঝলমলে আলোর জোয়ার রাস্তা মাটি সবুজ বনের ছোপ যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবে, ঘুমিয়ে স্বপ্নেও যা ভাবা যায় না কখনও, রূপকথায় রাজপুরী আর ময়দানবের তৈরি সভা মিলেমিশেও হয়ে থাকে ধানের মরাই ঘেঁষা কোঠাবাড়ি আর ওই ইস্টিশন। এটা হবে বুঝি বিলেত দেশটার সদর গেট, না কী বল ? কানুর মা যে ফিরে গিয়ে গল্প করছিল কালীঘাটে ধন্না দিতে এয়ে সে গপ্পের সদর গেট হবে বুঝি। কত্তাবাড়ির গেট কতটুকু, তাতে হাতি বাঁধা রয় ! আয়গো বড়োকত্তাবাড়ির বেটাছেলে পরি-সাজা মাগিরা, এয়ে চোখ চেয়ে দেখে যা গেট কাকে বলে !

লক্ষ্মীর চোখে সব সওয়ার পুরু পর্দা, কিছুই তাতে চমক লাগায় না। মস্ত বড়ো পুল, চকচকে পুল। মরণ জানে কার কী কাজে লাগে। রাজরাজড়ার শখ হবে বুঝি। হোক গে যাক বাবা, যার শখ সে পুল বানাক, তার সগগে ওঠার সিঁড়ি তো লয় !

সুদর্শনের অনেকদিনের বিরহী চোখে অনেক সায় আর অনেক সমর্থন। হাঁ, একেই বলে ব্রিজ। নির্ঘাত। ইস্পাতের আশ্চর্য অদ্ভুত সংগঠন, সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরীর উপযোগী তোরণদ্বার। নতুন সভ্যতার জয় ঘোষণা ! এতদিনে দেশটা যে একটু এগিয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বেনামি স্পর্ধায় জমকালো এ সৃষ্টি কী প্রখরতর হয়েছে ঝকঝকে সাদা রঙে—সত্যই উদার ক্ষমাশীল এ দেশ। এত ক্ষমা ভালো নয়। দেশটা থাকবে ভাঙা বাঁশেব সাঁকোয় আটকে, সে দেশের বুকে বিজ্ঞানের এমন আধুনিকতম কীর্তি সৃষ্টি করবে খেয়ালের বশে ! চরকার সঙ্গে সাঁকো মানায়, বেশ মানায়। এ ব্রিজ মানায় কী ? সুদর্শন বারবার শহরে আসে, প্রতিবার ট্রামে বাসে ব্রিজ পার হতে গেলেই সে সমস্ত চাকার শব্দে অবিরাম ধ্বনি শোনে, হায় এ দেশ !

সত্যি, এটা কী দেশ ? বুকের শিশুটাকে সুদর্শনের হাতে তুলে দিয়ে ব্লাউজের নীচেকার আঁটো জামাটার বোতাম খুলতে খুলতে সুন্দরী জলভরা চোখে ব্রিজের চোখ ঝলসানো রূপকে ঝাপসা করে নিতে থাকে, এ দেশের কিছু হবে না। অমন ব্রিজ বানিয়েছে, একফোঁটা দুধের ব্যবস্থা রাখেনি। মায়েরা যদি সবার সামনে বুক খুলে বাচ্চাকে দুধ দেয়, সবাই হাঁ করে চেয়ে থাকে, এমন ব্রিজেব দরকাব ! দ্যাখনা বাপু, অমন ব্রিজটা বয়েছে সবাই দ্যাখ না বাপু ব্রিজটা, সবাই মিলে আমাব দিকে তাকিয়ে আছিস কেন ? ব্রিজ দেখে কি চোখ ভরে না—অমন সুন্দর ব্রিজ !

শুধু ট্রাম চলছে ? বাব্বা, ভাগ্যে ট্রাম ছিল ? সেবারেও সব বন্ধ ছিল, ভাগ্যে ট্রাম চলছিল তাই কোনোমতে বাড়ি পৌঁছলাম।—কাঁধেব আঁচলটা কৃষ্ণা কোমবে জড়িয়ে বাঁধে, মুকুলেব গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হয়। আবাব সেই আগের বারের মতো ট্রামে যেতে হবে, শহরে দাঙ্গাহাঙ্গামা। সেবাব ট্রামে যাওয়া মনে আছে। চারিদিক থেকে সর্বাঙ্গে পুরুষের চাপ কিন্তু কী সুন্দর চওড়া ব্রিজ !

আগেও ব্রিজ ছিল, মুকুল ব্যথিত চোখে চওড়া উঁচু নতুন ব্রিজের উজ্জ্বল স্থবিরতা দ্যাখে।

আগের ব্রিজটার চিহ্নও কি রাখতে নেই ? ছিঃ ! চোখের ভর্ৎসনায় নতুন ব্রিজের বিবাটত্বকে উড়িয়ে দিতে না পেরে কলেজে ছেলে পড়ানোর ব্যবসায়ে ক্লান্ত নৃতত্ত্ববিদ ডাক্তার দে মাথা হেঁট করে।

চওড়া ব্রিজ, বুক বেয়ে বিরামহীন মানুষ আর যানবাহনের দুমুখী স্রোত, মাঝখানে ডবল ট্রাম লাইন, দুপ্রান্তে চওড়া ফুটপাথ। চলাচলের নতুন ঐশ্বর্যে এর মধ্যে মানুষ ভুলে গেছে ভারতেব সেই অন্যতম দ্রষ্টব্য বিস্ময়—ভাসমান ব্রিজটিকে। দুদিন আগেও যা ছিল পারাপারের সম্বল। মফস্‌সলের মানুষ হাঁ করে দেখত গঙ্গায় অনড় অচল সেতুটিকে। গাড়ি আস্তে চলতে বলে মিসেস দে তাকাত নদীর দিকে। সত্যই কি নেই সেই বহু পরিচিত কর্দমাক্ত পুরানো পুলটি ? সেই পুবানো নোংরা নিচু পুল ?

পাশে থাকলে সেদিকে চেয়ে চেয়ে এই ব্রিজ দিয়ে চলা কত সার্থক হত ! তাদের নয় সাধ্য ছিল না নতুন জমি কেনার, পুরানো ভাঙাচোরা বাড়িটা ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি তুলতে হয়েছে, একখানা ইটও রাখতে পারেনি ভাঙা বাড়িটার। এ তো গবর্নমেন্টের ব্যাপার, অভাব কীসের ? পাশের দিকে পুরানো পুলটা নয় পড়েই থাকত। যে বোটগুলি বুকে ধরে রাখত পুরানো পুলটি তার দুটি পড়ে আছে পুরানো জঞ্জালের মতো নদীর এক প্রান্তে। এখন সমস্যা জাগে। সংশয় !

ওয়াজেদের চোখে ঐতিহাসিক বিদ্যার পুরু চশমা, বাইফোকাল। ব্রিজে ঝলসানো আলো যেন ধাঁধা লাগায়। পুরানো দিনের জীর্ণ সেতু বাতিল হয়ে গেছে মানুষের মনে উন্নত আধুনিক নতুনকে পেয়ে ভাবলে বিস্ময় জাগে, গর্বে রোমাঞ্চ হয় ! পুরানো পিছিয়ে-পড়া ধর্মোন্মাদ এই দেশ কত সহজে

আধুনিকতম সভ্য দেশের মতোই মাত্র দুদিনের একটু বিস্ময় বোধ করে কত সহজে কী অনায়াসে গ্রহণ করেছে বিজ্ঞানের রূপধরা বিরাট প্রগতিকে।

বাংলার রাজধানী। বিদেশির পররাজ্য হোক, তবু তো তার রাজধানী থাকে। ষোলো শো নব্বুই খ্রিষ্টাব্দে জব চার্নকের ভিত্তিপত্তন। হুগলির ফৌজদার শায়েস্তা খাঁর দাপটে সদলবলে পলাতক জব চার্নকের কেন যে পছন্দ হয়েছিল তুচ্ছ নগণ্য সুতানুটি গ্রামটিকে ইতিহাস তা জানে কিন্তু বলে না। বলে না বোধ হয় দিল্লির বাদশা ফারুক শার খাতিরে, জব চার্নকের পছন্দের ভবিষ্যৎ যার অজানা ছিল। ইতিহাস শুধু জানাব ভান করে সতেরো শো চোদ্দো খ্রিষ্টাব্দে ১৩ই মে ইংরেজ বণিকরা ফারুক শার কাছে ত্রিশটি গ্রামের ইজারা প্রার্থনা করে দরখাস্ত দাখিল করেছিল। ত্রিশটি গ্রাম ! ইজারা ! দরখাস্ত !

জাহানারার কাজলা চোখে সাদা ব্রিজে ঠিকরানো পড়ন্ত রোদের চেয়ে ঝলমলো আলো খেলতে পারে।—ছোড়দো তুমারা হিস্টিরি ঔর লেকচার। হিস্টিরিয়া হোগি।

পিটার রবসনের কটা স্থির চোখে সব আলো সব রক্ত বিয়ারের সাদা ফেনা আর সোনালি স্বচ্ছতা। ইয়েস, ইয়েস। এ তার কল্পনা তারই পরিকল্পনা। এ দেশের পরম পরিণতির সিম্বল। জানো বিল্লীদাস, হোয়াইট ক্লাবে আমার ঘরের জানালা দিয়ে ব্রিজটা গড়ে উঠতে দেখেছি আর ভেবেছি This is no competition with Tajmahal, it's the fulfilment ! জানো ডিয়ার বেটি, এ দেশে. .

ডিয়ার বেটির পাতলা চোখে শুধু আমেরিকার আকাশেই সূর্য উঠে ও আমেরিকার ব্রিজেই আলো ঝলসায়, সে বলে, তুমি যদি ওয়াশিংটনে যেতে—

যাওয়া ভালো, আসা ভালো, তাতে দিল খুশ থাকে ! বুপেয়াসে নফা, বাস। হাতে হাত মিলাও, আসল ওই। বিল্লীদাস সত্যসত্যই বেটির মার্কিনি হাতে হাত মেলায়, রবসনের ইংরেজি হাতও বাদ দেয় না। এ ব্রিজ কুছু না। আমেরিকার প্রোডাকশন কত ! প্রোডাকশন চালু রইলে এমন কত ব্রিজ আপনাসে গজাবে।

ব্রিজ পারাপারে ভয় নেই। ব্রিজের এ মাথা ও মাথা চলাচল করার তো মানে নেই, ব্রিজটারও সে মানে নয়। পেরিয়ে কোথাও যেতে হবে, এ পারে ও পারে কোথাও যাওয়া আসার জন্য ব্রিজ। ও পারে শহরটাতে ভয়, বিপদ। তাই এমন মস্ত ঝকঝকে নিরাপদ ব্রিজ থাকতেও হাজার হাজার মানুষ ও পারে না গিয়ে স্টেশন কামড়ে পড়ে আছে, কম্বল শতরঞ্চি বিছিয়ে গাদাগাদি করে। অসংখ্য মুখর কণ্ঠ মিলে আটকানো ঝড়ের আওয়াজ। মিশ্র ভাপসা একটা দুর্গন্ধ, বাতাসকে পর্যন্ত ভারী করেছে। ট্রেনের কামরার সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের, স্টেশন এলাকার কোনো পার্থক্য নেই। নবাগত ট্রেনের উগড়ে দেওয়া যাত্রীরা ঘোলা জলে কাদা জল মেশার মতো স্টেশনের ভিড়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

ব্রিজ পেরিয়ে যেতে হবে। ব্রিজের ওপারেই ঘরবাড়ি আশ্রয় সংসার জীবন। প্রাণ হাতে করে নিয়ে যাওয়ার খানিক আশা আছে যাদের তাদের অন্তত যেতে হবে। যাদের তাও নেই তারাই পড়ে থাক।

ঝকঝকে প্রাইভেট গাড়িগুলি যায় সবার আগে। গাড়ির পেন্টে আঁচড়ের দাগ পড়েনি।

তোমাদের ভয় কী ? বিল্লীদাস রবসন বেটিকে অভয় দেয়, একদম দাঙ্গার মাঝে হেঁটে যাও কেউ কুছু বলবে না। তোমাদের সাথে ঝগড়া কার ?

জাহানারার চোখ ঝলসে ওঠে, ছোড়দো তুমারা হিস্টিরি, উজবুক। ভলান্টিয়ারকো পুছো কেইস্যা যানা হ্যায়। তুম কোন হো বাতাও।

ওয়াজেদ মাথা নামিয়ে সায় দেয়। তাই ভালো ! এই ব্রিজের কোনো ঐতিহাসিক মানে হয় না।

কৃষ্ণা বলে, আমায় যদি গাউন পরাতে তবে ঠিক হত, অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত ! তুমি একা হলে তোমার সায়েবি পোশাক কাজে লাগত, আমাব সঙ্গে দেখে সবাই চিনে ফেলবে না ? একটু কায়দা করে কাপড়টা পরে নেব যাতে চেনা না যায় আমি ঠিক—?

মুকুল ক্ষোভের সঙ্গে বলে, মানুষ সত্যি আর মানুষ নেই।

সুন্দরীর কাঁদো কাঁদো গলায় একটু ঝাঁঝ এসেছে, হাঁ করে দাঁড়িযে না থেকে দ্যাকো না বাবু ভলান্টিয়ারদের খোঁজ করে ? যদি কোনো উপায় হয ?

সুদর্শন মাথার ঝাঁকি দিয়ে বলে, কাবা সত্যি ভলান্টিযাব, কারা ডাকাত তাই যদি জানতাম—

অনাথের হাত ধরে টানতে টানতে লক্ষ্মী বলে, আ মব ছোঁড়া, আয না চট কবে। বাবুবা লবি করে পৌঁছে দেবে বলছে, লবি যে বোঝাই হল, জায়গা পাবি নে যে, ছুটে চল। সগ্‌গে যাবাব জ্বালা ঢের কম বাপু, তা মোর মরণ নেই।

পোঁটলাটা ঘাড়ে তুলে গুলু বলে, চ যাই, পা চালাই।

পুটুলিটা বগলে নিযে বিমী বলে, চ।